بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

বিশেষ প্রকাশনা:
"জলসা সালানা সংখ্যা"

বাৎসরিক
গ্রাহক-মূল্য

Rs. 600/-

সাপ্তাহিক
বদর
Weekly কাদিয়ান
BADAR Qadian
Bangla

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড-10

সংখ্যা
51-52

সম্পাদক
তাহির আহমদ মুনীর

www.akhbarbadr.in

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 বৃহস্পতিবার 18-25 Dec, 2025 18-25 ফাতাহ, 2025 26 জামাদিউল সানি- 4রজব-1447 A.H

ইসলামী শিক্ষার আলোকে জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব ও কল্যাণ

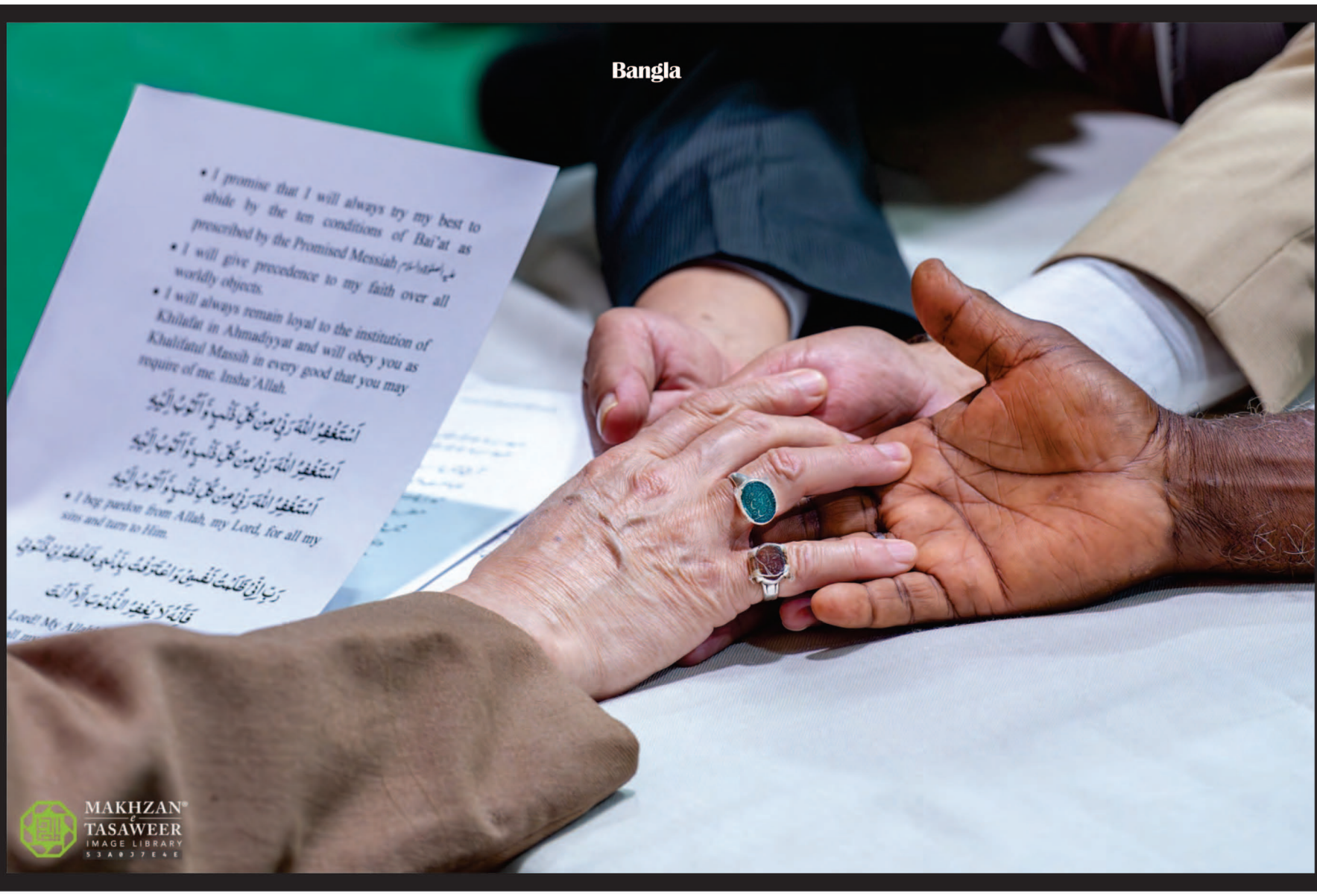

২০২৫ সালের যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় বিশ্বজনীন ঐক্যের এক প্রাণবন্ত দৃশ্য,
প্রিয় হুযুরের আধ্যাত্মিক হাতে সমগ্র জগত সমবেত হয়েছে

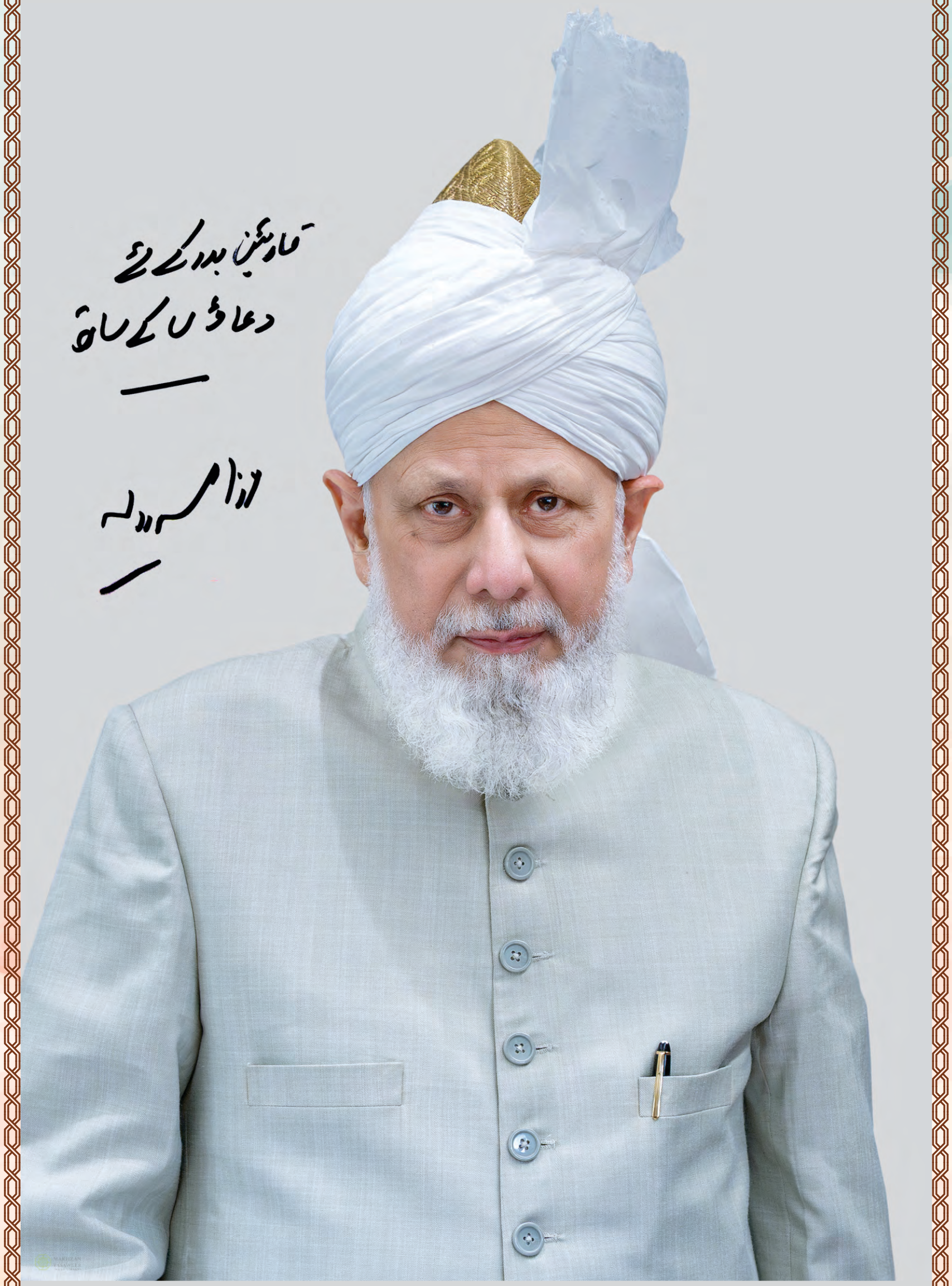

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মো’মেনীন মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামিস আইয়েদাহুল্লাহু তা’লা বিনাসরিহিল আযীয

ইসলামি শিক্ষায় জাতীয় ঐক্যের যে গুরুত্ব ও বরকতের কথা বর্ণিত হয়েছে, আজ খিলাফতে আহমদিয়ার ছায়াতলে আহমদিয়া মুসলিম জামাআত তার বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

"ইসলামি শিক্ষার আলোকে জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব ও কল্যাণ"শীর্ষক বদর-এর বিশেষ সংখ্যার জন্য হযরত আমিরুল মুমিনীন (আয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজিজ) যে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও আলোকপ্রদ বার্তা প্রেরণ করেছেন, তা বদর-এর পাঠকদের জ্ঞানবর্ধনের উদ্দেশ্যে নিম্নে প্রকাশ করা হলো। অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও হুজুরে আকদাস বদর-এর পাঠকদের জন্য তাঁর বরকতময় বার্তা প্রেরণ করেছেন, এর জন্য বদর-এর সম্পাদকমণ্ডলী হযরত আমিরুল মুমিনীনের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে । (সম্পাদকমণ্ডলী)

বদর-এর বিশেষ সংখ্যার জন্য হযরত আকদাস আমিরুল মুমিনীন (আয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা)-এর স্নেহপূর্ণ বার্তা

ইসলামাবাদ, যুক্তরাজ্য
MA-6-11-2025

সাপ্তাহিক 'বদর কাদিয়ান'-এর প্রিয় পাঠকবৃন্দ,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য-যিনি বদর পত্রিকা-কে "ইসলামি শিক্ষার আলোকে জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব ও বরকত" শীর্ষক একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের তাওফিক দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা একে সব দিক থেকে বরকতময় করুন। আমিন। এই উপলক্ষে আমাকে একটি বার্তা প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে আমি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাই।

ইসলাম মুসলমানদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও সংহতির শিক্ষা দেয় এবং পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ ও বিভেদের পথ অবলম্বন করতে নিষেধ করে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন:

"আর তোমরা সকলে একত্রে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না।" (আলে ইমরান ৩:১০৪)

অনুরূপভাবে একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতকে ভ্রান্তি ও গোমরাহির ওপর একত্রিত করবেন না। আল্লাহর সাহায্য জামাআতের সঙ্গে থাকে। যে ব্যক্তি জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, সে যেন আগুনের দিকেই নিক্ষিপ্ত হলো।" (তিরমিজি, কিতাবুল ফিতান)

এই একই শিক্ষা হযরত মসিহে মাওউদ (আ.) তাঁর জামাআতকেও প্রদান করেছেন। তিনি বলেন:

"সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর ওপর কত বড় অনুগ্রহ ছিল এবং তারা কত গভীরভাবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্যে বিলীন ছিলেন। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, কোনো জাতিকে প্রকৃত অর্থে জাতি বলা যায় না এবং তাদের মধ্যে জাতীয়তা ও ঐক্যের চেতনা সঞ্চারিত হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা আনুগত্যের নীতিকে গ্রহণ করে। আর যদি মতভেদ ও বিভেদ বিদ্যমান থাকে, তবে বুঝে নেবে-এগুলো অবক্ষয় ও পতনের লক্ষণ। আল্লাহ তাআলার হাত জামাআতের ওপর থাকে-এটাই মূল রহস্য। আল্লাহ তাআলা একত্ব পছন্দ করেন, আর এই একত্ব আনুগত্য ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সংক্ষেপে, সাহাবাদের মতো অবস্থা ও ঐক্যের প্রয়োজন আজও বিদ্যমান। কারণ আল্লাহ তাআলা এই জামাআতকে, যা মসিহে মাওউদের হাতে গড়ে উঠছে, সেই জামাআতের সঙ্গেই যুক্ত করেছেন, যা রাসুলুল্লাহ (সা.) গড়ে তুলেছিলেন। আর যেহেতু জামাআতের অগ্রগতি এমন মানুষদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমেই হয়, সেহেতু তোমরা-যারা মসিহে মাওউদের জামাআত নামে পরিচিত এবং সাহাবাদের জামাআতের সঙ্গে যুক্ত হতে আকাঙ্ক্ষী-নিজেদের মধ্যে সাহাবাদের রং সৃষ্টি করো। তোমাদের আনুগত্যও তেমন হওয়া চাই, পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বও তেমন হওয়া চাই। সর্বোপরি, প্রতিটি দিক ও প্রতিটি রূপে তোমরা সাহাবাদেরই মতো হয়ে ওঠো।"

(তাফসির হযরত মসিহে মাওউদ, খণ্ড ৩, পৃ. ৩১৭-৩১৯)

তিনি আরও বলেন: খোদাতা'লা চাচ্ছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সব সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তৌহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তার ভক্ত দাসদেরকে এক ধর্মে একত্রিত করেন তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক। এটাই খোদাতা'আলার অভিপ্রায় আর এজন্যেই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি।

(আল-ওসিয়ত, রুহানি খাযায়েন, খণ্ড ২০, পৃ. ৩০৬-৩০৭)

অতএব আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একটাই-যেন বিশ্ব তার স্রষ্টাকে চিনে নেয় এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকার তলে একত্রিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে আজ প্রকৃত ঐক্য কেবল হযরত মসিহে মাওউদ (আ.)-এর জামাআতের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য সবাই বিভেদের শিকার এবং আল্লাহ তাআলার এই নিয়ামতের কদর না করা পর্যন্ত তারা এমনই থাকবে। সুতরাং আমরা সৌভাগ্যবান যে, খিলাফতের বরকতে আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছি এবং সারা বিশ্বে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করে চলেছি। আল্লাহ তাআলা চান-হযরত মসিহে মাওউদ (আ.)-এর প্রিয় জামাআত এক হাতের ওপর ঐক্যবদ্ধ থাকুক। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে এমটিএ-এর নিয়ামত দান করেছেন, তা জামাআতের মধ্যে ঐক্য ও খিলাফতের সঙ্গে গভীর সম্পর্ককে পরিপূর্ণভাবে সঞ্চার করেছে। আমরা দেখি-যখন এমটিএ-তে খলিফাতুল মসিহের জুমআর খুতবা ও ভাষণ সম্প্রচারিত হয়, তখন বিশ্বের প্রতিটি দেশ, জাতি ও বর্ণের আহমদি গভীর ভালোবাসা ও ভক্তির সঙ্গে তা শ্রবণ করে; এতে তাদের ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস শক্তিশালী হয় এবং ঐক্য ও একতার ক্ষেত্রে তারা আরও অগ্রসর হয়। অতএব ইসলামি শিক্ষায় জাতীয় ঐক্যের যে গুরুত্ব ও বরকতের কথা বর্ণিত হয়েছে, আজ খিলাফতে আহমদিয়ার ছায়াতলে আহমদিয়া মুসলিম জামাআত তার বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

আমার দোয়া-আল্লাহ তাআলা যেন সকল পাঠককে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার এবং এই হাবলুল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে রাখার তাওফিক দান করেন। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন। আমিন।

ওয়াসসালাম,
খাকসার,
খলিফাতুল মসিহ (৫ম)

সূচিপত্র

বদর পত্রিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে হুযুর (আই.)-এর বার্তা	১
বিদায় হজ্জের ভাষণ	৪
পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট-এর নামে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস -এর পত্র	৬
সমকালীন সমস্যাবালীর ইসলামী সমাধান *-হযরত খলীফাতুল মসীহ (৪র্থ)-এর ভাষণ থেকে*	৭
জাতীয় ঐক্য ও সমন্বয় -এইচ শামশুদ্দীন কালাশোরী,সম্পাদক-মালায়ালি বদর	৮
ইসলামে সাম্যের শিক্ষা *-হাফিয সৈয়্যদ রসুল, মুবাল্লিগ নশর ইশাআত*	১৫
ধর্মীয় পরিবেশে শান্তির দূত *– মুনির আহমদ খাদিম, সম্পাদক বদর পত্রিকা (উর্দু)*	২০

জাতীয় ঐক্য কীভাবে অর্জিত হতে পারে?

আমাদের প্রিয় স্বদেশ ভারত–যা নানাবিধ ধর্ম, জাতিগোষ্ঠী, বর্ণ ও নৃগোষ্ঠীর আবাসস্থল–সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার জাতীয় সংহতির পরিবেশ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। এই অবনতির জন্য মূলত ধর্ম দায়ী নয়; বরং রাজনৈতিক সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহারই এ পরিস্থিতির প্রধান কারণ। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত রাজনীতিবিদরা এ অবস্থার জন্য দায়ী। উদাহরণস্বরূপ, যে রাজনীতিবিদরা হিন্দুধর্মের পরিচয় বহন করেন, তারা হিন্দু ভোটারদের কাছে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে হিন্দুধর্মকে বিপদের মুখে রয়েছে বলে চিত্রিত করেন এবং এর মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করে নিজেদের রাজনৈতিক লক্ষ্য সফল করতে চান। যখন হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতারা এমন রাজনীতিবিদদের সমর্থন করেন এবং সহধর্মীদের তাদের সঙ্গে যুক্ত করতে সচেষ্ট হন–কখনও কখনও সহিংসতার আশ্রয় নিয়েও–তখন এই রাজনৈতিক সাফল্য তাদের কাছে অত্যন্ত নিকটবর্তী বলে প্রতীয়মান হয়।

একই ধরনের পরিস্থিতি কিছু মুসলিম রাজনীতিবিদের মধ্যেও দেখা যায়। তারাও মুসলিম জনসাধারণকে বোঝান যে ইসলাম বিপদের মধ্যে রয়েছে, এবং তাদের নিন্দনীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে দৃঢ় করতে মুসলিম আলেমদের সমর্থন নেন, যাতে নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করতে পারেন। অন্যান্য ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর রাজনীতিবিদদের মধ্যেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ প্রবণতা কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়; প্রতিবেশী দেশগুলোতেও ধর্মকে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার আবরণ হিসেবে ব্যবহারের এই অনৈতিক চর্চা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান ভারতের তুলনায় আরও অগ্রসর হয়েছে। গত পাঁচ দশকে পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা–প্রায়শই ধর্মীয় নেতাদের সাহায্যে–ধর্মকে ব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থকে এগিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আজ পাকিস্তানের যে অবস্থা তা সবার সামনে স্পষ্ট: না সেখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রইল, না ধর্মের প্রকৃত চেতনা অটুট থাকল। অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে এবং সামাজিক সম্পর্কও বিপন্ন হয়েছে। ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ–সবই বিখণ্ডিত হয়ে আছে।

ভারতে পাকিস্তানের পর এই পরিস্থিতি ক্রমে দেখা দিচ্ছে, এবং দুঃখজনক যে প্রতিদিনই তা আরও তীব্রতর হচ্ছে। পাকিস্তানে যখন প্রথমবার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় উগ্রতার সূত্রপাত হয়, তখন তার সামনে শিক্ষা নেওয়ার মতো সমসাময়িক কোনো উদাহরণ ছিল না। কিন্তু ভারতের সামনে পাকিস্তানের একটি শিক্ষণীয় ও সতর্কতামূলক উদাহরণ বিদ্যমান।

শুধু তাই নয়–ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ইউরোপের ইতিহাস থেকেও শিক্ষা নিতে পারে, বিশেষত দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সেই ভয়াবহ ও অন্ধকার যুগ থেকে। তখন ধর্মীয় উগ্রবাদীরা নিজেদের জাগতিক স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্যে নিরপরাধ মানুষের উপর অত্যাচার চালায়; জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীদের লাঞ্ছনাকর শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। গ্যালিলিওসহ আরও বহু পণ্ডিতকে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের আদালতে দাঁড় করানো হয়েছিল। কিন্তু ইউরোপ যখন রাজনীতি ও ধর্মকে পৃথক করে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করল, তখন অগ্রগতির এক নতুন যুগের সূচনা হল–যা আজও অব্যাহত, এবং বহু ইউরোপীয় দেশ এখনো উপমহাদেশ ও এশিয়ার বহু দেশের তুলনায় অগ্রগামী।

সেই যুগটি 'ইউরোপীয় রেনেসাঁ'বা নবজাগরণের যুগ নামে পরিচিত। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এই ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন এবং সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করবেন না, এটাই কাম্য। যেন তারা আবারও সেই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাকে ফিরিয়ে না আনেন, যার কারণে একটি পুরো সভ্যতাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল।

তবে বিষয়টি এখানেই শেষ হয় না। ইউরোপ তার জাগরণ–পর্বে জাগতিক উন্নতির সাথে সাথে ধর্মের ইতিবাচক ভূমিকা উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত ধর্ম থেকে পুরোপুরি বিস্মৃত হয়েছিল। তার ফলে নৈতিক মূল্যবোধের এক উল্লেখযোগ্য অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। "স্বাধীনতা"র নামে লজ্জা–শরম ও শালীনতাকে উপেক্ষা করা হয়েছে, এবং সেই পুনর্জাগরণের যুগের পর ইউরোপ আজ আবারও এক প্রকার আত্মিক শূন্যতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

ভারত ও পাকিস্তানের মতো দেশগুলো এই ইতিহাস থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারে। প্রধান শিক্ষা হলো–যে সকল ধর্মীয় নেতা ধর্মকে দুনিয়াবি স্বার্থে ব্যবহার করেন, তাদের বর্জন করতে হবে; এবং ধর্মের সেই মহৎ উদ্দেশ্যকে পুনরুদ্ধার করতে হবে, যার মাধ্যমে মানবের সঙ্গে তার সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যদি এই সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবে জাগতিক উন্নতি যেমন বজায় থাকবে, তেমনি আত্মিক উন্নতিও–যা অন্তরের শান্তির প্রধান উৎস–অর্জিত হবে।

এই পথেই জাতীয় সংহতি অর্জিত হতে পারে। ভারতসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ কখনোই অগ্রসর হতে পারবে না, যদি না তাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ঐক্যের পরিবেশ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তদুপরি সেই ঐক্য দেশের সীমানা অতিক্রম করে প্রতিবেশী দেশগুলোতেও বিস্তৃত হতে হবে, এমনকি সমগ্র পৃথিবীকে ঐক্য ও সম্প্রীতির আলোয় আলোকিত করতে হবে। এ মহান লক্ষ্য সংকীর্ণ রাজনীতি বা দুনিয়াবি স্বার্থে ধর্মের অপব্যবহারের মাধ্যমে কখনোই অর্জিত হতে পারে না; এটি কেবল নিঃস্বার্থ ভালোবাসার মাধ্যমেই বিকশিত হতে পারে। আর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা জন্মায় খাঁটি আধ্যাত্মিকতা থেকে–যা আমাদের প্রতিটি ধর্মেই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। প্রয়োজন কেবল এই যে প্রত্যেক ধর্মের পণ্ডিতগণ তাঁদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে এই ভালোবাসা ও ঐক্যের অমূল্য সম্পদ আহরণ করে জনগণের সামনে উপস্থাপন করবেন।

পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন:

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ

অর্থ: "সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার, এবং আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক প্রিয়, যে তাঁর পরিবার (সৃষ্টিজগত)–এর প্রতি সর্বাধিক কল্যাণ করে।"

(বেহকী, শু'আব আল–ইমান; মিশকাত, করুণা ও দয়া প্রসঙ্গ, হাদিস ৭১২)

অবশেষে, আলোচনা শেষ করছি আহমদিয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা, হযরত মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহদীর আশিসমণ্ডিত বাণী দ্বারা:

"পরম বিনয় ও সম্মানের সঙ্গে আমি মুসলমানদের আলেম, খ্রিস্টান মিশনারি, ভারতের হিন্দু পণ্ডিত ও আর্য সমাজের নেতৃবৃন্দকে এ ঘোষণা পাঠাচ্ছি যে নৈতিক, বিশ্বাসগত এবং আত্মিক দুর্বলতা ও ভ্রান্তির সংশোধনের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি। আমি সেই মতের বিরোধী যে ধর্মের জন্য তলোয়ার তোলা উচিত, কিংবা ধর্মের নামে ঈশ্বরের বান্দাদের রক্ত ঝরানো উচিত। আমি মুসলমান, খ্রিস্টান, হিন্দু ও আর্য সকলের নিকট এ কথা প্রকাশ করছি যে পৃথিবীতে আমার কোনো শত্রু নেই। আমি মানবজাতিকে ভালোবাসি মা যেমন সন্তানকে ভালোবাসে–বরং তার চেয়েও বেশি। মানবতার প্রতি সহানুভূতি আমার কর্তব্য, এবং মিথ্যা, শিরক, অত্যাচার, অনাচার, অবিচার ও অনৈতিকতার প্রতি ঘৃণা আমার নীতি।"

(আরবাঈন, পৃ. ১–২)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

আল্লাহ্ নিশ্চয় সুবিচার ও উপকার সাধন করিবার এবং আত্মীয়স্বজনকে (দান করিবার ন্যায় অন্য লোকদিগকেও) দান করিবার আদেশ দিতেছেন

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে পুরুষ ও নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনিতে পার; নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকি; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সর্ববিদিত। (সূরা হুজরাত: ১৪)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○ (سورة النساء2)

হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদিগকে একই আত্মা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা হইতে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা হইতে বহু নর ও নারী বিস্তার করিয়াছেন; এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাঁহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট আবেদন কর, এইরূপে আত্মীয়তার বন্ধনের ক্ষেত্রেও (তাকওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষণকারী। (সূরা নিসা: ২)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! কোন জাতি যেন অন্য জাতিকে হাসি-বিদ্রুপ না করে, তাহারা উহাদের অপেক্ষা উপত্তম হইতে পারে; এবং নারীগণও যেন অন্য নারীগণকে হাসি-বিদ্রুপ না করে, তাহারা উহাদের অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে। এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না; এবং একে অপরকে অবজ্ঞাসূচক উপাধি দিয়া ডাকিও না। ঈমান আনার পর দুষণীয় নাম (দিয়া ডাকা) বড়ই মন্দ কথা; এবং যাহারা ইহার পর তওবা করিবে না তাহারাই যালেম। (সূরা হজুরাত: ১২)

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْۤا اِلَيْهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○ (سورة الممتحنة9)

যাহারা (তোমাদের) ধর্মের ব্যাপারে তোমদের সহিত যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে তোমাদের ঘর-বাড়ী হইতে বিতাড়িত করে নাই তাহাদের সঙ্গে আল্লাহ্ তোমাদিগকে সদ্ব্যবহার এবং ন্যায়-বিচার করিতে নিষেধ করেন না, নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়-বিচারকগণকে ভালবাসেন। (সূরা মুমতাহানা: ৯)

اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰۤى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

আল্লাহ্ শুধু তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে নিষেধ করেন, যাহারা (তোমাদের) ধর্মের ব্যাপারে তোমাদদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে আর তোমাদিগকে তোমাদের ঘর-বাড়ী হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, এবং তোমাদিগকে বিতাড়িত করিতে অন্যদের সাহায্য করিয়াছে; এবং যাহারা তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে- তাহারাই যালেম হইবে। (সূরা মুমতাহানা: ১০)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۚ اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও, এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদিগকে এই অপরাধ করিতে আদৌ প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর, ইহা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় তোমরা যে কাজ-কর্ম করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (সূরা মায়েদা: ৯)

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথায় আস যাহা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান- আমরা যেন আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুকেই আমরা শরীক না করি এবং যেন আমাদের মধ্যে কতক অপর কতককে আল্লাহ্ ব্যতীত প্রভু স্বরূপ গ্রহণ না করে।' অতঃপর, যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে তোমরা বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা (আল্লাহ্‌র নিকট) আত্মসমর্পণকারী।' (সূরা আলে ইমরান: ৬৫)

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ○

নিশ্চয় আমারা তোমাকে সত্যসহকারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি; এবং এমন কোন জাতি নাই যাহার নিকট সতর্ককারী আগমণ করে নাই। (সূরা আল ফাতের: ২৫)

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অনুগ্রহ ও নেয়ামত স্বরূপ। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়। (সূরা হুজরাত: ৯)

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○ (سورة النحل91)

আল্লাহ্ নিশ্চয় সুবিচার ও উপকার সাধন করিবার এবং আত্মীয়স্বজনকে (দান করিবার ন্যায় অন্য লোকদিগকেও) দান করিবার আদেশ দিতেছেন এবং (সর্বপ্রকার) অশ্লীলতা ও মন্দ কার্য এবং বিদ্রোহ করিতে বারণ করিতেছেন। তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (সূরা নহল: ৯১)

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○

নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ উহাদের প্রাপককে অর্পণ কর, এবং যখন তোমরা লোকের মধ্যে বিচার কর তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার কর। আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহার উপদেশ দিতেছেন নিশ্চয় উহা অতি উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা নিসা: ৫৯)

বিদায় হজ্জের কালান্তক ভাষণ

হিজরী নবম বর্ষে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো তা'লা আলায়হে ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লাম হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় এলেন। সেদিন তাঁর ওপরে কুরআন করীমের যে প্রসিদ্ধ আয়াতটি নাযিল হয়, তা হচ্ছে– "আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দিনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি, ওয়া রাযিতু লাকুমল ইসলামা দিনা" অর্থাৎ 'আমি আজ তোমাদের ধর্মকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিলাম: এবং যে–সব আধ্যাত্মিক পুরস্কার খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাগণের জন্য অবতীর্ণ হতে পারে, তা সমস্তই তোমার উম্মতের জন্য দান করলাম। তাছাড়া এটাও ফয়সালা করে দেওয়া হলো যে, তোমাদের ধর্ম শুধু মাত্র আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যের ওপরে স্থাপিত' (সূরা মায়েদা: ৪)। এই আয়াত তিনি (সা.) মুজদালেফার ময়দানে হজ্বের উদ্দেশ্যে সমবেত লোকের সামনে উচ্চ:স্বরে পাঠ করে শোনান। মুজদালেফা থেকে ফেরার পরে হজ্বের রীতি অনুযায়ী তিনি মদীনাতে থামেন এবং ১১ই যিলহজ্ব তারিখে তিনি (সা.) সমবেত সমস্ত মুসলমানদের সামনে দাঁড়িয়ে এক ভাষণ দান করেন। এই ভাষণে তিনি (সা.) বলেন: 'হে লোক সকল! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। কেননা, আমি জানি না যে, এই বৎসরের পর আর কখনও আমি এই ময়দানে তোমাদের সাথে দাঁড়িয়ে আর কোনও বক্তৃতা দিতে পারবো কি–না। 'আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জীবন ও তোমাদের সম্পদ একে অপরের হামলা থেকে কেয়ামত পর্যন্ত পবিত্র ও নিরাপদ করে দিয়েছেন।

'আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক ব্যক্তির উত্তরাধিকারের অংশ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এ ধরনের কোন ওসীয়্যত বৈধ হবে না, যা কোন বৈধ উত্তরাধিকারীর ক্ষতির কারণ হয়। 'যার ঘরে যে সন্তান পয়দা হবে, সে তারই সন্তান হবে। এবং কেউ যদি এই সন্তানের পিতৃত্বের ওপরে দাবী উত্থাপন করে, তাহলে সে শরীয়ত মোতাবেক প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করবে। 'যে ব্যক্তি অন্য কাউকে নিজের পিতা বলে

দাবী করবে, কিংবা কাউকে নিজের মালিক বলে মিথ্যা দাবী করবে, তার উপরে খোদার এবং ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে।

'হে লোক সকল! তোমাদের স্ত্রীদের উপরে তোমাদের যেমন হক্ (অধিকার) আছে, তেমনি তোমাদের ওপরেও তোমাদের স্ত্রীদের হক্ (অধিকার) আছে। তাদের ওপরে তোমাদের অধিকার হচ্ছে যে, তারা সতীত্ব বজায় রেখে জীবন যাপন করবে। এবং তারা এমন অশালীন কিছু করবে না,যাতে মানুষের সামনে তাদের স্বামীদের কোনও সম্মানহানি ঘটে। এ জাতীয় কিছু যদি তারা করে, তাহলে তোমরা (কুরআন করীমের নির্দেশ অনুযায়ী তা যাচাই করবে এবং আদালতের ফয়সালা মোতাবেক) তাদেরকে শাস্তি দিবে, কিন্তু তাতে কোন বাড়াবাড়ি করবে না। কিন্তু, যদি তারা এমন কিছু না করে, যা তাদের স্বামী ও বংশের জন্য অবমাননার কারণ হয়, তাহলে তোমাদের কর্তব্য হবে, তোমাদের সাধ্যমত তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত করা। মনে রাখবে যে, সর্বদাই নিজেদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে। কেননা, খোদা তা'লা তাদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব তোমাদের ওপরে ন্যস্ত করেছেন। নারীরা দুর্বল, তারা তাদের অধিকার নিজেরা রাক্ষা করতে পারে না। কাজেই, তোমরা যখন তাদেরকে বিবাহ করো, তখন খোদা তা'লা তাদের অধিকার রক্ষার জন্য তোমাদেরকে জামিন নিযুক্ত করে দেন। খোদা তা'লার আইন মোতাবেক তোমরা তাদেরকে তোমাদের ঘরে নিয়ে আস। অতএব, খোদা তা'লার অর্পিত সেই জামানতের কখনই খেয়ানত করবে না। এবং স্ত্রীদের অধিকার রক্ষার প্রতি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

'হে লোক সকল! তোমাদের হাতে এখনও কিছু যুদ্ধবন্দী রয়ে গেছে। আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা তাদেরকে তা–ই খাওয়াবে, যা তোমরা নিজেরা খাও। এবং তাদেরকে তা–ই পড়তে দিবে, যা তোমরা নিজেরা পড়। যদি তারা এমন কোন অপরাধ করে ফেলে, যা তোমরা ক্ষমা করতে পার না, তাহলে তাদেরকে অন্যের কাছে দিয়ে দিবে। কেননা, তারা খোদারই বান্দা। তাই, কোনও অবস্থাতেই তাদেরকে কোনরূপ কষ্ট দেওয়া বৈধ হবে না।

'হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তা শোন এবং ভালভাবে মনে রেখো। 'প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই। তোমরা সবাই সমান। সব মানুষ, তা তারা যে কোন জাতিরই হোক আর যে ধর্মেরই হোক, মানুষ হওয়ার কারণে, পরস্পর সমান। –(এই কথা বলার সময় তিনি (সা.) তাঁর উভয় হাত উপরে তুললেন এবং এক হাতের আঙ্গুলগুলিকে অপর হাতের আঙ্গুলগুলির সঙ্গে মিলালেন এবং বললেন) যেভাবে দুই হাতের আঙ্গুলগুলি পরস্পর সমান, সে ভাবেই সকল মানুষ পরস্পর সমান।

'তোমাদের কোন অধিকার নেই যে, তোমরা একে অন্যের ওপরে কোন শ্রেষ্ঠত্বের দাবী কর। তোমরা পরস্পর ভাই।' তিনি (সা.) আবার বলেন : 'তোমরা কি জান, এখন কোন্ মাস? এই এলাকা কোন এলাকা? তোমাদের কি জানা আছে,আজকের দিন কোন্ দিন?' লোকেরা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, এই মাস পবিত্র মাস। এই এলাকা পবিত্র এলাকা। আজকের দিন হজ্বের দিন।' তাদের সকলেরই উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতে থাকলেন, 'যেভাবে এই মাস পবিত্র মাস, যেভাবে এই এলাকা পবিত্র এলাকা, যেভাবে এই দিন পবিত্র দিন, তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি মানুষের জান, মাল ও সম্মান পবিত্র করে দিয়েছেন। এবং কারো জানের ওপরে কিংবা মাল ও সম্মানের ওপরে হামলা করা ঠিক তেমনি অবৈধ যেমন অবৈধ, এই মাসের এই এলাকায় এই দিনের অমর্যাদা করা। এই হুকুম শুধু আজকের জন্যই নয়, শুধু কালকের জন্যই নয়, বরং সেই দিন পর্যন্ত প্রত্যেক দিনের জন্য, যেদিন তোমরা খোদার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে'। তিনি (সা.) আরও বললেন, 'এই সমস্ত কথা, যা আমি আজ তোমাদেরকে বলছি, তা তোমরা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিও। কেননা, এমনও হতে পারে যে, যারা আজ আমার কথা আমার কাছ থেকে শুনছে, তাদের চাইতে যারা আমার কাছ থেকে আমার এই কথা শুনছে না, তারা এই সকল কথার ওপরে বেশি আমল করবে, বেশি বেশি পালন করবে।"

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ প্রসঙ্গে বলেন:

"এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ বলে দিচ্ছে যে, মানুষের মঙ্গল এবং তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য রাসূলে করীম (সা.) কত বেশী উদ্বিগ্ন ছিলেন। এবং নারীজাতি ও দুর্বলের অধিকার রক্ষার প্রতি কত বেশি আন্তারিক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জানতেন যে, তাঁর ইহজীবনের দিন শেষ হয়ে আসছে। হয়তোবা আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর জীবনের সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাই, তিনি চান নি যে, যে নারীদেরকে মানব জন্মের আদি থেকেই পুরুষদের দাসী বানিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আদেশ–নির্দেশ দেওয়ার পূর্বেই তিনি জগৎ ছেড়ে চলে যান। তিনি চেয়েছিলেন যে, ঐ সকল যুদ্ধবন্দী, যাদেরকে মানুষেরা ক্রীতদাস বলে আখ্যায়িত করে, এবং যাদের ওপরে নানা প্রকার অত্যাচার চালাতে থাকে, তাদের অধিকার সুরক্ষিত করার পরই তিনি যেন দুনিয়া চেড়ে চলে যান। তিনি চান নি যে, মানুষে মানুষে যে প্রকাশ্য প্রার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে, কাউকে পাতালে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তা ঘুচিয়ে দেওয়ার আগে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তিনি চান নি, যে সকল কারণে, জাতিতে, জাতিতে দেশে দেশে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং যুদ্ধ বিগ্রহের সৃষ্টি হয়, তা সর্ব–সাকল্যে দূরীভূত করার আগে তিনি এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। একে অপরের হক্ আত্মসাৎ করা বা অধিকার খর্ব করা সব সময়েই বর্বর যুগের এক অভিশাপ বলে গণ্য করা হয়। তার অশুভ বাসনাকে যতক্ষণ না হত্যা করা হয়, ততক্ষণ তিনি পৃথিবী ছেড়ে যেতে চান নি। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের জান ও মালকে সেই পবিত্রতা, সেই নিরাপত্তা, দান না করা হয়, যা খোদা তা'লার পবিত্র মাসগুলোকে খোদা তা'লার পবিত্র ও কল্যানমন্ডিত স্থানসমূহকে দান করা হয়েছে, ততক্ষণ তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চান নি। নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা দান, সব জাতির জন্য নিরাপত্তা ও শান্তি স্থাপন, মানবজাতির মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদির জন্য এত বেশি গভীর উদ্বেগ ও আন্তরিকতা পৃথিবীর আর কোনও মানুষের মাঝে কেউ কি কখনও দেখেছে? হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মানবজাতির জন্য এত ভালবাসা, এত আকুলতা, এত সংকল্প আর কোন মানুষের মধ্যে কি কখনও দেখা গেছে? এসব কারণেই তো ইসলামের মধ্যে নারীরা তাদের সম্পত্তির মালিক। যে মালিকানা অর্জন করতে পেরেছে ইউরোপ ইসলামের তেরশ' বছর পরে। এর কারণেই তো ইসলাম গ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য সবার সমান হয়ে যায়, তা স যত ছোট এবং যত নীচ জাতের লোকই হোক না কেন। স্বাধীনতা ও সাম্যের শিক্ষা ও আদর্শ কেবল ইসলাম, হ্যাঁ, কেবল ইসলামই কায়েম করেছে পৃথিবীতে। এবং এমনভাবে কায়েম করেছে যে, আজ পর্যন্ত দুনিয়ার আর কোন জাতি তা করতে পারে নি। আমাদের মসজিদে একজন সম্রাট কিংবা একজন সম্মানিত ধর্মীয় নেতাও একজন সাধারণ মানুষের সমান। সেখানে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য বা কোন ভেদাভেদ নেই। অথচ, অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয়গুলোতে বড় ও ছোটর মধ্যে ভেদাভেদ আজ–অব্দি বজায় রয়েছে। যদিও সেই জাতিগুলি স্বাধিকার ও সাম্যের কথা মুসলমানদের চাইতে অনেক বেশি জোর গলায় প্রচার করে চলেছে। ['নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তোফা (সা.)' পুস্তক থেকে]।

সমস্ত সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবার, এবং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় সেই ব্যক্তি, যে তাঁর পরিবারের প্রতি সদাচরণ করে।

সহল ইবন সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"আমি এবং যে ব্যক্তি এতিমের দেখাশোনা করে, জান্নাতে এভাবে পাশাপাশি থাকব।" এ কথা বোঝাতে তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুল সামান্য ব্যবধান রেখে পাশাপাশি দেখান। (সহীহ বুখারি) (হাদিকাতুস সালিহীন, হাদীস ৭১২)

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهٗ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهٗ۔

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "মজুরের ঘাম শুকানোর আগে তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করো।"

(ইবন মাজাহ, কিতাবুর রূহুন) (হাদিকাতুস সালিহীন, হাদীস ৭২৮)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللهُ تَعَالٰى ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رَجُلٌ اَعْطٰى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهٗ وَرَجُلٌ اسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهٖ اَجْرَهٗ۔

আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন: "তিন ব্যক্তি আছে, যাদের প্রতি কিয়ামতের দিন আমি কঠোর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াব:

(১) সে ব্যক্তি, যে আমার নামে কাউকে নিরাপত্তা প্রদান করে, তারপর তাকে প্রতারণা করে; (২) সে ব্যক্তি, যে একজন স্বাধীন মানুষকে বন্দি করে বিক্রি করে এবং সেই মূল্য ভোগ করে; (৩) সে ব্যক্তি, যে একজন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করে, তার কাছ থেকে পূর্ণ কাজ করিয়ে নেয় কিন্তু তার নির্ধারিত মজুরি প্রদান করে না।" (সহীহ বুখারি, কিতাবুল বাইউ' ,"স্বাধীন মানুষ বিক্রি করার পাপ; ইবন মাজাহ–তেও উল্লেখিত) (হাদিকাতুস সালিহীন, হাদীস ৭২৮)

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ۔

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ সত্যিকার অর্থে মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ না সে অন্যের জন্যও সেই বিষয়টাই কামনা করে যা সে নিজের জন্য কামনা করে।"

অর্থাৎ, যদি সে নিজের জন্য আরাম, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে, তবে অন্যের জন্যও একই কামনা করবে। (সহীহ বুখারি, কিতাবুল ঈমান, "ভাইয়ের জন্য সে জিনিস ভালবাসা যা নিজের জন্য ভালবাসে) (হাদিকাতুস সালিহীন, হাদীস ৭৩১)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ لِيْ اَنْ اَعْلَمَ اِذَا اَحْسَنْتُ اَوْ اِذَا اَسَاْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُوْلُوْنَ : قَدْ اَحْسَنْتَ ، فَقَدْ اَحْسَنْتَ وَاِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُوْلُوْنَ : قَدْ اَسَاْتَ ، فَقَدْ اَسَاْتَ۔

ইবন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)–কে জিজ্ঞেস করল, "আমি কীভাবে বুঝব যে আমি ভালো কাজ করছি, না মন্দ কাজ করছি?"নবী করিম (সা.) বললেন:

"যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীদেরকে বলতে শুনবে যে তুমি ভালো, তখন বুঝবে তোমার আচরণ ভালো; আর যখন প্রতিবেশীদেরকে বলতে শুনবে যে তুমি মন্দ, তখন বুঝবে তোমার আচরণ মন্দ।"

(ইবন মাজাহ, আবওয়াবুয যুহদ) (হাদিকাতুস সালিহীন, হাদীস ৪২৩)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهٗ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ۔

আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে–অর্থাৎ প্রকৃত মুমিন–সে যেন কখনো তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নীরব থাকে।" (সহীহ বুখারি, কিতাবুল আদব, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে) (হাদিকাতুস সালিহীন, হাদীস ৪২৭)

عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ حَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ وَسْطِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَلَا اِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَاِنَّ اَبَاكُمْ وَاحِدٌ ، اَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلٰى عَرَبِيٍّ وَلَا لِاَحْمَرَ عَلٰى اَسْوَدَ وَلَا لِاَسْوَدَ عَلٰى اَحْمَرَ اِلَّا بِالتَّقْوٰى اَبَلَّغْتُ ؟ قَالُوْا اَبَلَّغَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۔

ثُمَّ قَالَ : اَيُّ يَوْمٍ هٰذَا ؟ قَالُوْا : يَوْمُ حَرَامٍ ، قَالَ : اَيُّ شَهْرٍ هٰذَا ؟ قَالُوْا : شَهْرُ حَرَامٍ ، قَالَ : ثُمَّ اَيُّ بَلَدٍ هٰذَا؟ قَالُوْا: بَلَدٌ حَرَامٍ ، قَالَ : فَاِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ ، قَالَ : وَلَا اَدْرِيْ ، قَالَ اَوْ بَلَدَكُمْ هٰذَا ۔ اَبَلَّغْتُ ؟ قَالُوْا : بَلَّغَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔

আবু নযরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে তাকে সেই ব্যক্তি অবহিত করেছিলেন, যিনি মিনার দিনসমূহে হজ্জাতুল বিদা'র সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রদত্ত খুতবা নিজ কানে শুনেছিলেন। সেই খুতবায় নবী করিম (সা.) ঘোষণা করেন: "হে মানুষ! তোমাদের প্রভু এক, এবং তোমাদের পিতা এক। মনে রেখো-কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের, কিংবা কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই; একইভাবে কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর কোনো কৃষ্ণবর্ণের মানুষের, কিংবা কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতবর্ণের মানুষের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব কেবলই তাকওয়া ও নৈতিক উৎকর্ষের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। আমি কি এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দিয়েছি?

লোকেরা উচ্চস্বরে বলল, "হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল সত্যই এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন।" এরপর নবী করিম (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, "আজ কী দিন?"তারা বলল, "এটি (হজের) অত্যন্ত পবিত্র দিন।" তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এ মাস কোন মাস?"তারা বলল, "এটি (যিলহজের) অত্যন্ত পবিত্র মাস।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "এ শহর কোন শহর?"তারা বলল, "এটি (মক্কার) অত্যন্ত পবিত্র শহর।" তখন নবী করিম (সা.) বললেন: "তোমাদের জীবন ও সম্পদ (এবং বর্ণনাকারীর স্মরণে নেই যে তিনি সম্মানের কথাও উল্লেখ করেছিলেন কি না) এই দিন, এই মাস এবং এই শহরের ন্যায়ই পবিত্র ও সম্মানযোগ্য। যেমন তোমাদের পক্ষে এই দিন, মাস ও শহরের পবিত্রতা লঙ্ঘনের কথা কল্পনাও করা অসম্ভব-তেমনি মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মান লঙ্ঘন করাও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।" তারপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দিয়েছি? লোকেরা বলল, "হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল সবকিছুই পৌঁছে দিয়েছেন।" তিনি বললেন, "তাহলে যারা এখানে উপস্থিত, তারা যেন এটি তাদের কাছে পৌঁছে দেয় যারা অনুপস্থিত।" (মুসনদ আহমদ, খণ্ড ৫, পৃ. ৪১১; খণ্ড ১, পৃ. ২৩০, ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা) (হাদিকাতুস সালিহীন, মলিক সাইফুর রহমান, হাদীস ৭০৪)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ اِخْوَانًا ۔ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ : لَا يَظْلِمُهٗ وَلَا يَخْذُلُهٗ وَلَا يَحْقِرُهٗ وَلَا يَخْذُلُهُ التَّقْوٰى هٰهُنَا ۔ وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهٖ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهٗ وَمَالُهٗ وَعِرْضُهٗ۔

ইবন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমরা পরস্পরের প্রতি হিংসা করো না। কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে কৃত্রিমভাবে মূল্য বৃদ্ধি করো না। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না। একজন আরেকজনের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না-অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতার মনোভাব গ্রহণ করো না। তোমাদের ভাই যে ব্যবসা করছে তার ওপর তোমরা ব্যবসা করো না। বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা হও এবং পরস্পরের প্রতি ভাই ভাই হয়ে চলো। কোনো মুসলিম তার ভাইকে অত্যাচার করে না, তাকে হেয় করে না, তাকে লজ্জিত বা অপমানিত করে না।"

এরপর তিনি তাঁর বুকে ইঙ্গিত করে বললেন, "তাকওয়া এখানে।" এটি তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন। তারপর বললেন, "মানুষের দুর্ভাগ্যের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে সে তার মুসলিম ভাইকে ঘৃণার চোখে দেখে। প্রতিটি মুসলিমের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান অপর মুসলিমের জন্য অমার্জনীয় এবং অপরিহার্য সম্মানের বিষয়।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলা) (হাদিকাতুস সালিহীন, হাদীস ৭০৫)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا ۔

যদি কোন গির্জা বা অন্য কোন উপাসনালয়ে নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তারা আমাদেরকে তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো দেখতে পাবে।

আজ যদি এসব গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র বিস্ফোরিত হয়, পরবর্তী অনেকগুলো প্রজন্ম তাদের উপর স্থায়ী প্রতিবন্ধিতা বা পঙ্গুত্ব আরোপের জন্য আমাদেরকে কোন দিন ক্ষমা করবে না।

যেহেতু বিশ্বে আপনার এক প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর রয়েছে, আমি আপনাকেও আরো বিস্তৃত পরিসরে বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য তাগিদ করছি যে, খোদা তা'লার প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক যে ভারসাম্য, তার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে তারা নিজেদের ধ্বংসের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

খৃষ্টজগতের আধ্যাত্মিক গুরু পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট-এর নামে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্ব-প্রধান-এর পত্র

বিশ্বব্যাপী আহমদিয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম, সাইয়্যিদনা হযরত মির্জা মাসরুর আহমদ, খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আই.), খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম মুহূর্ত থেকেই বিশ্বকে সর্বগ্রাসী ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে রক্ষার বিষয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বজুড়ে উন্নত দেশগুলোর বিভিন্ন পরিষদে অবিরামভাবে তাঁর আধ্যাত্মিক কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করে যাচ্ছেন-যা গভীর বেদনা ও উদ্বেগে পরিপূর্ণ-এবং সামনে আসন্ন ভয়াবহ ও অশনি সংকেতপূর্ণ বিপদসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। ইসলামের সোনালি শিক্ষায় সজ্জিত পত্রসমূহের মাধ্যমে তিনি বিশ্বনেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে তারা ভবিষ্যতের সেই ভীতিকর দিনগুলোর কথা বিবেচনায় রেখে নিজ নিজ পরিসরে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আরও জোরদার করেন।

তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে, জার্মানির একটি সামরিক সদর দপ্তরে, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল হিলে, ইউরোপীয় পার্লামেন্টে, নিউজিল্যান্ডের জাতীয় পার্লামেন্টে এবং নেদারল্যান্ডসের জাতীয় পার্লামেন্টে এইসব ভাষণ প্রদান করেছেন। এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন শান্তি সম্মেলনে বহু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ভাষণ প্রদান করেছেন। অধিকন্তু, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আহ্বান জানিয়ে তিনি বহু বিশ্বনেতার নিকট পত্র প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রপতি, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, দুই পবিত্র মসজিদের খাদেম সৌদি আরবের বাদশাহ, গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী, জার্মানির চ্যান্সেলর, যুক্তরাজ্যের রানি, ফরাসি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, রুশ ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতি এবং পোপ বেনেডিক্ট ষোড়শ।

এদের মধ্যে ২০১১ সালে খ্রিস্টানদের বৈশ্বিক আধ্যাত্মিক নেতা পোপ বেনেডিক্ট ষোড়শের নিকট প্রেরিত পত্রটি পাঠকবৃন্দের উপকারার্থে 'বদর'-এ নিচে সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এই পত্রের অধ্যয়ন থেকে স্পষ্ট হয় যে, আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ইমাম এমন এক সময়ে আসন্ন বৈশ্বিক বিপর্যয়ের বিষয়ে বিশ্বকে সতর্ক করে আসছিলেন, যখন অন্যান্য বিশ্বনেতারা এর গুরুত্ব সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ ছিলেন এবং এসব সতর্কবার্তাকে সময়ের আগেই উচ্চারিত বলে মনে করতেন। কিন্তু আজ, যখন আমরা এই পত্রটি পুনঃপ্রকাশ করার সৌভাগ্য অর্জন করছি, তখন বিশ্ব এই ধ্বংসকে অত্যন্ত নিকটে উপস্থিত বলে অনুভব করছে।

অতএব, আজও এই আধ্যাত্মিক কণ্ঠস্বরের প্রতি কর্ণপাত করা অত্যন্ত জরুরি। প্রত্যেক মানুষ-বিশেষত প্রত্যেক আহমদি-নিজ নিজ সামর্থ্যের পরিসরে এই আসন্ন বিপর্যয়ের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সমগ্র মানবজাতিকে অবহিত করবে এবং হুযূরের (আল্লাহ যেন তাঁর সহায় হন) ভাষায় এই বার্তা পৌঁছে দেবে যে: "মানবজাতির উচিত তার স্রষ্টাকে চেনা; কেননা একমাত্র এটিই মানবতার সুরক্ষার নিশ্চয়তা।"

হিজ হোলিনেস পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট,

আমার দোয়া এই যে আল্লাহ্ তা'লা আপনার উপর তাঁর অনুগ্রহ ও কল্যাণ বর্ষণ করুন।আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান হিসেবে আমি হিজ হোলিনেস পোপের নিকট পবিত্র কুরআনের বাণী পৌঁছে দিচ্ছি:

"তুমি বল, 'হে আহ্লে কিতাব! তোমরা এমন এক কথায় (একমত) হও, যা আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে অভিন্ন (আর তা হলো এই), আমরা যেন আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত না করি এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকেই শরীক না করি। আর আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে আমরা নিজেরা একে অন্যকে যেন প্রভু-প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করি।" [৩:৬৫]

ইসলাম আজকাল বিশ্বের শ্যেনদৃষ্টির নিচে আছে, আর প্রায়শই একে ঘৃণ্য অভিযোগের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হচ্ছে। অবশ্য, যারা এসব অভিযোগ করে থাকেন, তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা নিয়ে কোন অনুসন্ধান না করেই এরূপ করে থাকে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কতিপয় মুসলিম সংগঠন, কেবল নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইসলামকে সম্পূর্ণ ভুল আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছে। এর ফলে পশ্চিমা ও অমুসলিম দেশসমূহের মানুষের হৃদয়ে মুসলমানদের প্রতি অনাস্থা বৃদ্ধি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে।

প্রত্যেক ধর্মের উদ্দেশ্য হল মানুষকে খোদা তা'লার নিকট নিয়ে যাওয়া এবং মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। কোনদিন কোন ধর্মের প্রবর্তক তাঁর অনুসারীদেরকে অন্যের অধিকার হরণ বা নিষ্ঠুর আচরণের শিক্ষা দেন নি। তাই গুটি কতক বিপথগামী মুসলমানের আচরণকে ইসলাম বা এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা (সা.)-এর উপর আক্রমণের বাহানা বানানো উচিত নয়। ইসলাম আমাদেরকে সকল ধর্মের নবীগণকে সম্মান করার শিক্ষা দেয়, আর এ জন্য পবিত্র বাইবেল বা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত সকল নবীর উপর বিশ্বাস রাখা সকল মুসলমানের জন্য আবশ্যক। আর এর মধ্যে যিশুখ্রিস্ট (আ.) পর্যন্ত সকল নবীই অন্তর্ভুক্ত। আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নগণ্য দাস, আর তাই তাঁর উপর আক্রমণসমূহে গভীরভাবে মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হই; কিন্তু আমরা বিশ্বের সামনে তাঁর অনুপম গুণাবলী ও পবিত্র কুরআনের সুন্দর শিক্ষা আরো ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমেই এর উত্তর দিয়ে থাকি।

যদি কেউ কোন শিক্ষা অনুসরণের দাবি করে অথচ সঠিকভাবে সেই শিক্ষার অনুসরণ না করে তবে সেই ব্যক্তিই এর জন্য দায়ী, সেই শিক্ষা নয়। ইসলাম শব্দের অর্থই শান্তি, সৌহার্দ্য, নিরাপত্তা। 'ধর্মের বিষয়ে কোন বল প্রয়োগ নেই' - এটি পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট আদেশ। প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পবিত্র কুরআন ভালবাসা, সহমর্মিতা, শান্তি, বিবাদ মিটিয়ে ফেলা ও ত্যাগের স্পৃহার শিক্ষা দিয়েছে। পবিত্র কুরআন বারবার বলে যে, যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণতা অবলম্বন করে না সে আল্লাহ্ তা'লা থেকে বহু দূরে। অতএব, যদি কেউ ইসলামকে রক্তপাতের শিক্ষায় পূর্ণ এক চরমপন্থী ও সহিংস ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করে, তবে এরূপ চিত্রের সাথে প্রকৃত ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় কেবলমাত্র প্রকৃত ইসলামের অনুশীলন করে থাকে এবং কেবলমাত্র সর্বশক্তিমান খোদার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে।

এরপর শেষের পাতায়.....

বিশ্ব-শান্তি ও জাতীয় ঐক্যের জন্য ধর্মের গঠনমূলক ভূমিকা

হযরত খলীফাতুল মসীহ (৪র্থ) রাহেমাহুল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ

'সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান' থেকে একটি উদ্ধৃতি।

" ধর্মের তো এটাই করণীয় ছিল যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করবে, বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের অনুসারীদের মধ্যে যে ভুল-বোঝাবুঝি ছিল তার নিরসন করবে, শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে এবং "নিজে বাঁচো এবং বাঁচতে দাও"নীতির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু তা না করে,দুর্ভাগ্যবশতঃ সমকালীন যুগে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মসমূহ যে সামান্য ভূমিকা পালন করেছে, তা অত্যন্ত ক্ষীণ ও নগণ্য। বরং আজও ধর্ম বিবাদ ও রক্তপাতকে উসকে দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী কার্যকর শক্তিগুলোর একটি। মানবসমাজে কষ্ট ও দুর্ভোগ সৃষ্টিতে ধর্মের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাকে কখনোই হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। অতএব, যদি আমরা সত্যিই বিশ্বশান্তি কামনা করি, তবে এই বিষয়ে যে ত্রুটিগুলো বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলো দূর করতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান ব্যতীত বৈশ্বিক শান্তির কোনো স্বপ্নই বাস্তবে রূপ নিতে পারে না। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও ধর্মের শক্তিকে নেতিবাচকভাবে ব্যবহার করা যায়। একই ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় অনুভূতিকে সেই ধর্মেরই অন্য কিছু অনুসারীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা যায়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে শুধু সংখ্যালঘু হওয়ার অপরাধে তাদের ওপর দুর্ভোগ ও নির্যাতনের পাহাড় চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব।

মুসলমানদের ইতিহাস এমন ভয়াবহ ও কলঙ্কজনক ঘটনার দ্বারা পরিপূর্ণ, যেখানে ইসলাম-যা শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম-নিরপরাধ মুসলমানদের নিরাপত্তা ও প্রশান্তি বিনষ্ট করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। নিপীড়িত ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহে মুসলমানই ছিলেন; তাদের একমাত্র "অপরাধ"ছিল এটাই যে, তাদের মতবাদ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতবাদের সঙ্গে এক ছিল না। ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে মুসলমানরা নিজেরাই ইসলাম-এর নামে প্রবল অত্যাচারের শিকার হয়েছে। গত চৌদ্দ শতকে মুসলমানদের পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘটিত "পবিত্র"যুদ্ধের সংখ্যা ও তীব্রতা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ক্রুসেডগুলোর তুলনায় বহুগুণ বেশি। এবং এই মর্মান্তিক কাহিনি এখনও থেমে যায়নি। পাকিস্তানে আহমদিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে আজ যা ঘটছে এবং শিয়া সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে যা প্রায়ই ঘটে থাকে-তা এই তিক্ত বাস্তবতায় দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যথেষ্ট। এ পরিস্থিতি আমাদের সতর্ক করে দেয় যে, যে অশান্তিদায়ক সমস্যা বহু আগেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তা আজও অবিকল রয়ে গেছে।

খ্রিস্টানরাও খ্রিস্টানদের ওপর অত্যাচার করেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ ধর্মীয় নির্যাতনের ঘটনা যদি সময়ের প্রবাহে মানুষের স্মৃতি থেকে প্রায় মুছে যেতে থাকে, তবে আয়ারল্যান্ডে চলমান ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংঘর্ষের দিকে একবার তাকালেই যথেষ্ট। অন্যান্য অঞ্চলেও খ্রিস্টধর্মের অভ্যন্তরীণ সম্প্রদায়ভিত্তিক সংঘাতের সুপ্ত বিপদ লুকিয়ে রয়েছে, যদিও এসব অঞ্চল বর্তমানে অন্য-ধরনের বিরোধে জড়িত। ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, নাইজেরিয়ায় খ্রিস্টান-মুসলিম সংঘর্ষ, মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদি-মুসলিম যুদ্ধ, অথবা ইহুদি-খ্রিস্টানদের সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং সেসব সম্পর্কে অবনতির গোপন প্রবণতা-এসবই ঐ লুকায়িত বিপদের লক্ষণ। এসব বিপদ ধর্মীয় জগতে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো, যা যে কোনো সময় অগ্ন্যুৎপাত করতে পারে। এসব ইস্যুতে আমাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির সংস্কারের গুরুত্ব এতই স্পষ্ট যে, এ বিষয়ে অতিরিক্ত জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

এই সমস্যাগুলোর সমাধান হিসেবে ইসলাম কী প্রস্তাব করে? পূর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নীচে তার প্রধান বিষয়গুলো সংক্ষেপে উপস্থাপিত হলো।

(১) সব ধর্ম-তারা ইসলামকে সত্য ধর্ম হিসেবে স্বীকার করুক বা না-করুক-এই মৌলিক ইসলামী নীতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে: অভ্যন্তরীণ সম্প্রদায়গত বিরোধ বা আন্তঃধর্মীয় সংঘাত সমাধানে কোনো অবস্থাতেই বলপ্রয়োগ বা জবরদস্তি ব্যবহার করা যাবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। ধর্মীয় স্বাধীনতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে: কোনো ধর্মগ্রহণ বা বর্জন করার স্বাধীনতা; নিজের বিশ্বাস ঘোষণা, অনুশীলন এবং প্রচারের স্বাধীনতা; কোনো মতবাদকে ভুল বলা; নিজের মতবাদ ত্যাগ বা পরিবর্তন করার স্বাধীনতা-এবং এ স্বাধীনতার পূর্ণ সুরক্ষা।

(২) সকল ধর্মাবলম্বী অন্তত এই ইসলামী নীতিটি অবশ্যই মানবেন: সব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ওশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। অন্যান্য ধর্ম ইসলাম-এর সত্য ও সার্বজনীনতা না-মানলেও-ইহুদিধর্ম, খ্রিস্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, কনফুসীয় মতবাদ, হিন্দুধর্ম, জরথুস্ট্রবাদ ইত্যাদির দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য ধর্ম মিথ্যা বা ঈশ্বরবিচ্ছিন্ন মনে হলেও-তাদের অবশ্যই প্রত্যেক ধর্মের পবিত্র ব্যক্তিত্বদের সম্মান করতে হবে। এতে তাদের নিজস্ব মতবাদে কোনো আপস করতে হবে না, কারণ পারস্পরিক সম্মান একটি মৌলিক মানবাধিকার। প্রত্যেক মানুষের এই মৌলিক অধিকার স্বীকার করা জরুরি যে, তার ধর্মীয় অনুভূতি ও আবেগ কোনোভাবেই আঘাতপ্রাপ্ত বা অপমানিত হবে না।

(৩) ধর্মীয় নেতাদের সম্মান করার নীতি কোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে কার্যকর করা যায় না-এ কথা মনে রাখতে হবে। ধর্মীয় অবমাননাকে নিকৃষ্ট আচরণ বিবেচনা করতে এবং তা নিরুৎসাহিত করতে জনমত জাগ্রত করতে হবে, যাতে সমাজ সম্মিলিতভাবে এমন অশোভন, অযৌক্তিক এবং নিকৃষ্ট কাজের নিন্দা করে।

(৪) বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত যে ধরণের আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনের সূচনা করেছিল, সেই ধরণের সম্মেলন ব্যাপকভাবে উৎসাহিত ও প্রচলিত হওয়া উচিত। এসব সম্মেলনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

(ক) বক্তারা তাদের নিজ নিজ ধর্মের আকর্ষণীয় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরবেন এবং অন্য ধর্মকে আক্রমণ বা নিন্দা করবেন না।

(খ) বক্তারা আন্তরিকভাবে অন্য ধর্মের গুণাবলি অনুসন্ধান করে সেগুলো তাদের বক্তব্যে তুলে ধরবেন এবং প্রকাশ করবেন যে তারা এসব গুণাবলিতে প্রভাবিত।

(গ) বক্তারা অন্যান্য ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের চরিত্র ও গুণাবলির প্রশংসা করবেন। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ইহুদি বক্তা পবিত্র প্রবর্তকের (ংধ) এমন গুণাবলি আলোচনা করতে পারেন-যেসব গুণ সবাই তাদের নিজস্ব বিশ্বাসের সঙ্গে আপস না করেই স্বীকার করতে পারেন। তেমনি কোনো মুসলিম বক্তা কৃষ্ণ সম্পর্কে বক্তব্য দিতে পারেন; কোনো হিন্দু যিশু বা বুদ্ধ সম্পর্কে বলতে পারেন; ইত্যাদি। ১৯৩০-এর দশকে ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক উন্নত করার লক্ষ্যে আহমদীয়া জামাতের উদ্যোগে এরূপ বহু উপকারী ও জনপ্রিয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

(ঘ) প্রস্তাব (গ)-এর ক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করতে হবে যে আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃধর্মীয় আলোচনায় ধর্মীয় বিতর্কের পবিত্রতা বজায় থাকে। আলোচনার ভুল পদ্ধতি বা ভঙ্গি থাকলে কেবল সেই পদ্ধতির নিন্দা করা উচিত-আলোচনা নিজেই কোনো অবস্থায় নিন্দনীয় বলা উচিত নয়। চিন্তাধারা এবং মতপ্রকাশের অবাধ আদান-প্রদানই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মানবাধিকার, এর প্রয়োজন যোগ্যতমের বিবর্তনের ধারণাটি টিকে থাকার জন্যই -এই নীতির সঙ্গে কোনো অবস্থাতেই আপোষ করা যাবে না।

(ঙ) মতবিরোধের ক্ষেত্র সংকুচিত করা এবং পারস্পরিক সমঝোতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করার জন্য এটি অপরিহার্য যে সব ধর্ম তাদের আলোচনা নিজেদের স্ব স্ব ধর্মের বিষয়াদি নিয়ে এবং অন্যান্য ধর্মের ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ রাখবে। কোরআনের এই ঘোষণা যে সব ধর্মের সূচনা একই ছিল-এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং গভীর প্রজ্ঞায় পূর্ণ। সব ধর্মের উচিত নিজেদের কল্যাণ ও মানবজাতির মঙ্গলার্থে এই কোরআনিক শিক্ষাকে সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনা করা এবং এর সত্যতা যাচাই করার জন্য গবেষণা করা।

(৫) যৌথ কল্যাণের সব প্রকল্প ও কর্মসূচিতে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা উচিত এবং তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উৎসাহিত হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, জনকল্যাণমূলক কাজে খ্রিস্টান, মুসলমান, হিন্দু ও ইহুদি সবাই একত্রে কাজ করতে পারেন।

অতীতের জ্ঞানী ও সাধকরা মানবজাতির ঐক্যের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন-ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবসমাজকে একটি পতাকার নিচে সমবেত হওয়ার যে কল্পনা করেছিলেন-শুধুমাত্র এভাবেই আমরা সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার আশা করতে পারি।"

(বিশ্ব-শান্তি, সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামিক সমাধান, পৃ: ৫৫)

জাতীয় ঐক্য ও সমন্বয়

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর বাণীর আলোকে

সংকলনে:
এইচ শামশুদ্দীন কালোশিরি
সম্পাদক: বদর-মালায়ালাম

জাতীয় ঐক্য

জাতীয় ঐক্য বলতে এমন এক অবস্থা বোঝায় যেখানে একটি জাতির সদস্যদের মধ্যে সংহতি, সাদৃশ্য ও পারস্পরিক বিশ্বাস বিদ্যমান থাকে-যা বর্ণ, ভাষা, ধর্ম বা আঞ্চলিক পার্থক্যের উর্ধ্বে অবস্থান করে। এর অর্থ হলো, জাতির সব শ্রেণি ও গোষ্ঠী সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রে কাজ করে এবং একে অপরের সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন ও শান্তির মূল রহস্য নিহিত রয়েছে এই নীতিতেই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যখন কোনো জাতি ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, তখন সে দৃঢ়তার সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়; কিন্তু যখন বিভেদ দেখা দেয়, তখন সে তার শক্তি ও প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে।

জাতীয় ঐক্য ও পবিত্র নবী (সা.)

পবিত্র কুরআন জাতীয় ঐক্যের নীতিকে গুরুত্ব দিয়ে ঘোষণা করেছে:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً

"মানবজাতি এক সম্প্রদায় ছিল।" (সূরা আল-বাকারা, ২:২১৪)। দুর্ভাগ্যবশত, মানবজাতি এই মৌলিক সত্যকে ভুলে গিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। তাই, সর্বশক্তিমান আল্লাহ দো-জাহানের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রেরণ করেন মানবজাতিকে পুনরায় একক সম্প্রদায়ে একত্রিত করার জন্য এবং ঘোষণা করেন:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"বলুন, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল, যারই আসমান ও জমিনের সার্বভৌম ক্ষমতা। তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই; তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল, উম্মি নবীর প্রতি ঈমান আনো-যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস রাখেন-এবং তাঁর অনুসরণ করো, যাতে তোমরা সঠিক পথে চলতে পারো।"

(সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৫৯)

এই মহৎ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য, পবিত্র নবী (সা.)-কে প্রদান করা হয়েছিল একটি সর্বজনীন শরিয়ত-পবিত্র কুরআন-যা সমগ্র বিশ্বের জন্য এক সতর্কবার্তা (সূরা আল-ফুরকান, ২৫:২)। এই ঐশী গ্রন্থে আহ্বান জানানো হয়েছে আহলে কিতাব এবং সমগ্র মানবজাতিকে নিম্নলিখিত বাণীর মাধ্যমে:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

"বলুন, হে আহলে কিতাব! এসো এমন এক কথায় ঐক্যবদ্ধ হই যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন-যে আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো উপাসনা করব না, তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করব না, এবং আমরা কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব না।" (সূরা আলে ইমরান, ৩:৬৫)

পবিত্র নবী (সা.) এরপর এমন এক মহৎ উদাহরণ স্থাপন করেন যা বর্ণ ও শ্রেণি-কালো-সাদা, দাস-প্রভু, আরব-অনারব-সব পার্থক্য দূর করে দেয়, যাতে সবাই একই সারিতে দাঁড়ায়; কবির ভাষায়,

"নাহি রইলো দাস, নাহি রইলো প্রভু।"

অতঃপর বিদায় হজের সময়, মানবজাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর শেষ বাণীতে, পবিত্র নবী (সা.) আবারও মানুষকে ঐক্যের উপদেশ দেন এবং তাঁর অনুসারীদের নির্দেশ দেন: "যে এখানে উপস্থিত আছে, সে যেন এই বার্তাটি অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেয়।"

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল ইলম)

পারস্য বংশীয় পুরুষ এবং একক উম্মাহর প্রতিষ্ঠা

মহানবীর উক্তিতে ব্যবহৃত "মিনকুম"(অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্য থেকে') শব্দটির প্রাথমিক সম্বোধন যদিও সকল সাহাবির প্রতিই ছিল, তথাপি তাঁদের মধ্যে হজরত সালমান আল ফারসি-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সে অনুযায়ী তিনি তাঁর এক বর্ণনায় বলেন-

"আমি আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, এবং এর পর আর কোনো উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হইনি।" (মুসনাদ আহমদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৪১-৪৪৪; ইবন সাদের আল তাবাকাত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৩-৫৭; ইবন ইসহাকের সূত্রে আসিম ইবন উমর ইবন কাতাদাহ আনসারি থেকে, তিনি মাহমুদ ইবন লাবিদ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন; এছাড়াও বায়হাকির দলাইল আল নবুওয়াতে সনদসহ বর্ণিত হয়েছে।)

এই সাধারণ বক্তব্য থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে ধারণা করা যায় যে, হজরত সালমান আল ফারসি বিদায় হজের মহান সমাবেশেও (হিজরি দশম সন) উপস্থিত ছিলেন। প্রকৃত সত্য আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

যাইহোক, সেই সময় উপস্থিত সাহাবিদের মধ্য থেকে এই মহান দায়িত্ব-নবীপ্রদত্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের দায়িত্ব-হজরত সালমান আল ফারসির কওমের ওপর অর্পণ করাই আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় ছিল। অতএব, শেষ যুগে আল্লাহর রাসূল তাঁর মিশনের উদ্দেশ্য পূর্ণতার জন্য ফারসের সন্তানদের মধ্য থেকে কিছু মহান ব্যক্তিত্বের আগমনের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।

পরবর্তীতে এই পবিত্র বংশধারার মধ্য থেকেই আল্লাহ তাআলা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে প্রতিশ্রুত মসিহ ও প্রতীক্ষিত মাহদি হিসেবে প্রেরণ করেন। তাঁর সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এই সাক্ষ্য প্রদান করেছেন- "এমন একজন ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর রাসূলকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসেন।"

জাতীয় ঐক্য ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)

এই যুগে ইমাম মাহদি-প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম উম্মাহকে পুনরায় একক ও স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে একত্রিত করা। পবিত্র নবী (সা.) এ ঐশী প্রতিষ্ঠিত জামাত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: "এটি হবে একক জামাত।" তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন: "তোমরা মুসলমানদের জামাত ও তাদের ইমামের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকো।"

তিনি আরও সতর্ক করে বলেছিলেন: "সব দল ও উপদল থেকে দূরে থাকো, এমনকি যদি তোমাকে কোনো বৃক্ষের শিকড় খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়, তবুও মৃত্যু না আসা পর্যন্ত এই অবস্থায় অটল থেকো।"

অতঃপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ পূর্বদেশের সেই মনোনীত সংস্কারক, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-কে নির্দেশ দেন:

أَنْجِعُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِيَجْتَمِعُوا عَلَى دِينٍ وَّاحِدٍ

"পৃথিবীর মুসলমানদের একত্রিত করো, যাতে তারা এক ধর্মে ঐক্যবদ্ধ হয়।"

অতএব, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর মিশন হলো মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় ঐক্য, ঈমান ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, এবং সেই সম্প্রদায়ের চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করা, যা গড়ে তুলেছিলেন পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস্ সালাম) বলেন:

"পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানকে 'একই ধর্মের উপর' একত্র করার যে নির্দেশ, এটি একটি বিশেষ ধরণের নির্দেশ এবং আমার এই ওহীর মধ্যে যে নির্দেশ রয়েছে, তা-ও একই প্রকৃতির বলে প্রতীয়মান হয়-অর্থাৎ, আল্লাহ তা'লা ইচ্ছা করেন যে বিশ্বের সকল মুসলমান এক ধর্মে ঐক্যবদ্ধ হোক, এবং নিঃসন্দেহে তারা ঐক্যবদ্ধ হবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে তাদের মধ্যে কোনো ধরনের মতভেদ আদৌ থাকবে না। মতভেদ থাকবে, কিন্তু তা হবে এমন প্রকৃতির, যা উল্লেখযোগ্য বা গুরুত্ববহ নয়।"

(আল-হাকাম, খণ্ড ৯, সংখ্যা ৪২, ৩০ নভেম্বর ১৯০৫, পৃ. ২)

অন্তিম যুগে, মানবজাতিকে পুনরায় একক উম্মত হিসেবে গঠন

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" (খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

করার লক্ষ্যে জাতীয় সমন্বয় ও ঐক্য সম্পর্কে হযরত মসীহ (আ.)-এর মহান দিকনির্দেশনাসমূহ কেবল পথপ্রদর্শক নীতিই নয়, বরং আলোকবর্তিকাস্বরূপ। তিনি বলেন:

সুতরাং, আল্লাহ বিভিন্ন জাতির মধ্যে পৃথক পৃথক গোষ্ঠী নির্ধারণ করেন এবং প্রতিটি জাতির ভেতরে একটি ঐক্যবোধ সৃষ্টি করেন। এই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা ছিল এই যে, জাতিসমূহের পারস্পরিক পরিচয় সহজতর হবে, তাদের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন জটিলতা থেকে মুক্ত থাকবে। যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগত পরিসরে পারস্পরিক পরিচয় ও সংহতি গড়ে উঠল, তখন আল্লাহ ইচ্ছা করলেন যে শেষ পর্যন্ত সমস্ত জাতিকে একক একটি সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করা হবে। এর দৃষ্টান্ত এমন-যেন কেউ একটি বাগান রোপণ করে, তার বিভিন্ন চারা আলাদা আলাদা বেডে বিন্যস্ত করে, অতঃপর চারদিক ঘিরে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে সব গাছকে একটিমাত্র পরিবেষ্টিত পরিসরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

এই নীতির দিকেই পবিত্র কোরআন ইঙ্গিত করেছে এই আয়াতে-

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

"নিশ্চয়ই তোমাদের এই সম্প্রদায় একটি একক সম্প্রদায়, এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।" (সূরা আম্বিয়া, ২১:৯৩)

অর্থাৎ, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত হে নবীগণ! এই মুসলমানরা, যারা পৃথিবীর নানা জাতি থেকে একত্রিত হয়েছে, তারা সকলেই তোমাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী একক একটি উম্মাহ; এবং আমি তোমাদের সকলের প্রতিপালক, অতএব তোমরা সম্মিলিতভাবে আমারই উপাসনা কর।

এটিই আল্লাহর সেই চিরস্থায়ী বিধান, যা প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত গ্রন্থসমূহে প্রতিফলিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেছেন যে ধীরে ধীরে ও পর্যায়ক্রমে মানবজাতির ঐক্যের পরিসর পরিপূর্ণতার চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হবে। প্রথমে সীমিত অঞ্চল ও ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়; এরপর চূড়ান্ত পর্যায়ে সকল মানুষকে এক স্থানে সমবেত করা হয়-যেমনটি হজের সমাবেশে পরিলক্ষিত হয়-যার প্রতিশ্রুতি পবিত্র কোরআনে দেওয়া হয়েছে:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا

"আর শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, অতঃপর আমরা সবাইকে একত্রে সমবেত করব।"

(সূরা কাহফ, ১৮:১০০)

অর্থাৎ, শেষ যুগে আল্লাহ তাঁর আহ্বানের মাধ্যমে সকল সৎ ও সৌভাগ্যবান মানুষকে একটি একক ধর্মের ওপর একত্রিত করবেন, যেমনটি তারা সৃষ্টির সূচনালগ্নে একটি ধর্মের ওপর ঐক্যবদ্ধ ছিল, যাতে সূচনা ও পরিণতির মধ্যে একটি সুষম সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, মানবজাতি আদিতে একটি জাতির ন্যায় ছিল; পরে যখন তারা সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়ে পড়ে, তখন পারস্পরিক পরিচয় ও সুবিধার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাদের বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করেন। এবং প্রত্যেক জাতির অবস্থা ও প্রয়োজনের উপযোগী একটি ধর্ম নির্ধারণ করেন-যেমনটি তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (الحجرات:14)

হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে পুরুষ ও নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনিতে পার। (সূরা হুজরাত: ১৪)

অতঃপর বলেন:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

অর্থ: আমরা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়ত (বিধান) এবং (স্পষ্ট) কার্য-পদ্ধতি নির্ধারিত করিয়াছি। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তিনি তোমাদের সকলকে এক উম্মত করিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের উপর যাহা নাযেল করিয়াছেন তদসম্বন্ধে তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। অতএব, তোমরা সৎকাজে একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা কর।

(সূরা মায়েদা: ৪৯)

"আরম্ভে মানবজাতি ছিল এক জাতি; পরে যখন তারা সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তৃত হলো, তখন পারস্পরিক পরিচয় সহজতর করার জন্য আল্লাহ তাদেরকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করলেন। প্রতিটি জাতির জন্য তিনি তাদের উপযোগী একটি ধর্ম নির্ধারণ করলেন, যেমন তিনি বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

'হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে জাতি ও কুলে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো' (৪৯:১৪)।

অতএব হে মুসলমানগণ! তোমরা সব সৎকর্মে অগ্রসর হও; কারণ তোমরা সকল জাতির সম্মিলন, এবং সকল প্রকার স্বভাব তোমাদের মধ্যে সংরক্ষিত।'

(চশমা-এ-মারিফাত, রূহানী খাজাইন, খণ্ড ২৩, পৃ. ১৪৪-১৪৬)

وَضَعْنَا النَّاسَ تَحْتَ أَقْدَامِكَ

হযরত মসীহ (আ.)-এর নিকট অর্পিত এই ঐক্যের ঐশী মিশনকে অগ্রসর করার উদ্দেশ্যে, আল্লাহ তা'লা তাঁর পর তাঁরই বংশধর-অর্থাৎ আবনা'উল ফারিস-এর মধ্য থেকে নবুয়তের ধারা অনুসরণকারী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে: "এদের মধ্য থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে স্থাপিত করা হবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণীরই পরিপূর্ণতায় তাঁর পরে ধারাবাহিকভাবে পাঁচজন খলিফা নিযুক্ত হয়েছেন।

তদুপরি, হযরত মসীহ (আ.) "ইন্নী মু'আকা বা মস্‌রূর'-এই ওহী দ্বারা সম্মানিত হন, যা ভবিষ্যতে হযরত মির্জা মস্‌রূর আহমদ, খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর খেলাফতের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

এই ধারাবাহিকতার মধ্যেই তিনি আরও একটি ওহী প্রাপ্ত হন: "وَضَعْنَا النَّاسَ تَحْتَ أَقْدَامِكَ"- অর্থাৎ "আমরা মানুষকে তোমার পদতলে রেখেছি"। (তাযকিরা, পৃ. ৬৩০)

জাতীয় সমন্বয়ের জন্য হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর প্রচেষ্টা

এই ওহীগুলো ইঙ্গিত করে যে জাতীয় ঐক্যের এই মহৎ মিশন হযরত মির্জা মস্‌রূর আহমদ, খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করবে। বহু খুতবা, ভাষণ ও রচনায় তিনি কেবল এই সত্যকে উদ্ভাসিতই করেননি, বরং এর বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে জামায়াতকে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনাও প্রদান করেছেন।

জাতীয় সমন্বয়ের তাৎপর্য

হুজুর (আই.) বলেন:

"কোনো দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা স্বভাবতই নিজেদের দেশের প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসা পোষণ করি। প্রত্যেক আহমদীরই কামনা থাকে যে তার দেশ বিশ্বসভায় বিশেষ মর্যাদা অর্জন করুক। সে এর জন্য চেষ্টা করে, দো'আ করে-এবং অবশ্যই তা করা উচিত। ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোনো আহমদী দেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে, এমনকি কোনো রাজনৈতিক দলে যোগও দিতে পারে। বহু দেশে আহমদীরা সরকারদল ও বিরোধী উভয় দলের মাধ্যমেই নিজেদের দেশকে উন্নত করার জন্য ভূমিকা পালন করছেন। অতএব নাগরিক হিসেবে রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক ও যথাযথ।

কিন্তু জামায়াতে আহমদীয়া একটি সংগঠন হিসেবে-এবং খেলাফতে আহমদিয়া-কোনো দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার বিন্দুমাত্র আগ্রহ রাখে না; এটি আমাদের উদ্দেশ্যই নয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)জ-এর সত্যপ্রেমী যুগপৎ অনুসারী যে পথ আমাদের দেখিয়েছেন, তা জাগতিক রাজ্য প্রাপ্তির জন্য নয়; বরং আত্মিক রাজত্ব অর্জন ও আল্লাহর সন্তুষ্টির মুকুট লাভের পথে পরিচালিত করে। তবুও দেশের স্থিতি, উন্নয়ন বা প্রয়োজনে যখনই কোনো সরকার আমাদের নিকট পরামর্শ বা ত্যাগ চেয়েছে, জামায়াতে আহমদীয়া তাতে অংশগ্রহণ করেছে-এবং আজও করে যাচ্ছে।

আমাদের উদ্বেগ সরকারকে ঘিরে নয়; বরং আমাদের উদ্বেগ দেশের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বকে কেন্দ্র করে। আমাদের উৎকণ্ঠা দেশের জনগণের জন্য। সেই কারণেই আমরা চেষ্টা করি-বরং আমাদের

মহানবী (সা.)-এর বাণী

যখন তোমাদের কাছে কোনও ধর্মপরায়ণ ও নীতিবান ব্যক্তি বিবাহ প্রস্তাব পাঠায়, তখন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে নিও; অন্যথায় পৃথিবীতে অশান্তি ও অরাজকতা তৈরী হবে। (তিরমিযি, কিতাবুন নিকাহ)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rasheed, Basantapur, 24 PGS (s)

সামর্থ্য যতদূর অনুমতি দেয়, প্রয়োজনে সারা পৃথিবী ঘুরেও–দেশকে যে কোনো ধরনের সংকট ও দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করার। এই মনোভাব ও কর্মপ্রচেষ্টা উৎসারিত হয়েছে সেই শিক্ষা থেকে, যা আমাদের প্রভু ও পথপ্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে দান করেছেন। এটি সেই আদর্শ অনুসরণেরই ফল, যা আমাদের প্রভু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন এবং যার অনুসরণকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন–এই ঘোষণা দিয়ে যে, এটাই তাঁর প্রিয় রাসূল, যার আদর্শ অনুসরণ করা তোমাদের জন্য অবশ্যকর্তব্য। মানবতার এই মহান উপকারক এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত যিনি, তিনি যে আদর্শ উপস্থাপন করেছেন, তার সারকথা এই–নিজের দুঃখ–কষ্ট ভুলে গিয়ে মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করা। (জুমার খুতবা, ৮ অক্টোবর ২০১০)

মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যের উপদেশ

মুসলিম উম্মাহকে উদ্দেশ করে হুজূর (আ.) বলেন:

"কয়েকদিন আগে, সৌদি আরবের সাম্প্রতিক ঈদের সময়, ইমাম–এ–কাবা হজ্জের খুতবায় মুসলিম দেশসমূহ ও মুসলিম উম্মাহকে তাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করতে এবং ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে আহ্বান করেছেন। যদিও খুতবাটি দীর্ঘ ছিল, মূল বক্তব্য এটিই। কিন্তু নিজেদের নির্ধারিত নীতির ভিত্তিতে তাদের পক্ষে এই ঐক্য অর্জন সম্ভব নয়। যেমন আগে বলা হয়েছে, তারা সবকিছু ভুলে গেছে–সম্মান, ঈমান, মর্যাদা–ফলে দীনও হারিয়েছে, দুনিয়াও হারিয়েছে। মুসলিম উম্মাহকে এক করার জন্য আল্লাহ যে পথ নির্দেশ করেছেন, সেই পথেই চলতে হবে। কোনো মানুষের বানানো পদ্ধতি কিংবা কোনো স্বঘোষিত ইমামের পরিকল্পনা কাজে আসবে না। কেবল তাকেই অনুসরণ করতে হবে, যাকে আল্লাহ ইমাম হিসেবে প্রেরণ করেছেন–যার প্রতি আল্লাহ ওহী করে বলেছেন যে 'পৃথিবীর সকল মুসলমানকে এক ধর্মে একত্র করো'। অতএব যুগের ইমামের সাথে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই এই উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।" (ঈদ–উল–আযহা খুতবা, ৭ নভেম্বর ২০১১)

ক্যালিমা পাঠকারী সকল মুসলমানের জন্য গভীর আত্মসমালোচনার এক মুহূর্ত

হযরত খলিফার অত্যন্ত প্রভাবশালী ও হৃদয়স্পর্শী উপদেশ সাধারণভাবে ক্যালিমা পাঠকারী সকল মুসলমানের জন্য এবং বিশেষভাবে মুসলিম দেশসমূহের জন্য এক গভীর চিন্তা ও আত্মসমালোচনার মুহূর্ত। তিনি বলেন–

"মুসলিম দেশগুলোর অন্তত এতটুকু হলেও সচেতন হওয়া উচিত যে তারা নিজেদের অবস্থান অনুধাবন করবে। পারস্পরিক মতভেদ দূর করে তাদের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা উচিত। যদি আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের এই নির্দেশ দিয়ে থাকেন যে, 'এসো, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যে বিষয়টি অভিন্ন, তার দিকে ফিরে আসি' (আল ইমরান ৩:৬৫)–অর্থাৎ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যে যৌথ ভিত্তি রয়েছে, তা হলো আল্লাহর সত্তা–তবে যাদের ক্যালিমা সম্পূর্ণরূপে এক ও অভিন্ন, সেই মুসলমানরা কেন তাদের পার্থক্য দূর করে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না? সুতরাং তাদের উচিত চিন্তা করা এবং নিজেদের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা, কারণ এটিই বিশ্ব থেকে বিশৃঙ্খলা দূর করার একটি কার্যকর উপায় হতে পারে। এরপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা যেন সর্বত্র ন্যায়বিচারের দাবি পূরণে এবং নিপীড়িতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় ও শক্তিশালী কণ্ঠে আওয়াজ তোলে। তারা যদি এক হয় এবং প্রকৃত ঐক্য গড়ে ওঠে, তবে তাদের কণ্ঠেও শক্তি থাকবে; অন্যথায় নিরপরাধ মুসলমানদের প্রাণহানির জন্য তারাই–বরং মুসলমান সরকারসমূহই–দায় বহন করবে।"

(খুতবা জুমা, ১৩ অক্টোবর ২০২৩)

বিচ্ছিন্নতা থেকে বিরত থাকো

শেষ যুগে ইমাম মাহদীর মাধ্যমে আল্লাহ উম্মাহকে দৃঢ় খেলাফতের রশিতে আবদ্ধ করেছেন এবং উপদেশ দিয়েছেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

"তোমরা সবাই আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং বিভক্ত হয়ো না। আর আল্লাহর সেই নিয়ামত স্মরণ করো–যখন তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু, তখন তিনি তোমাদের হৃদয়সমূহকে একত্র করলেন, এবং তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পরের ভাই হয়ে গেলে।" (৩:১০৪)

এই ঐশী আদেশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মুসলিম উম্মাহর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও এর বিধ্বংসী পরিণামের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে হুজূর (আই.) বলেন:

"মুসলমানরা যদি এক হয়ে যায়, তবে তারা তাদের সব দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারে।"

(জুমার খুতবা, ৭ জুলাই ২০২৩)

এ বক্তব্য মুসলিম বিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বিভেদ ও মতানৈক্য শুধু তাদের দুর্বলই করে না, বরং শত্রুদেরকে প্রভাব বিস্তারের সুযোগও প্রদান করে।

বিশ্বশান্তির স্বার্থে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে গিয়ে রাশিয়া–ইউক্রেন সংঘাতের প্রসঙ্গে হুজূর (আ.) বলেন:

"এই যুদ্ধ আমাদের–মুসলমানদের–জন্য শিক্ষা হওয়া উচিত: দেখো কিভাবে অন্যরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে; অথচ মুসলমানরা একই কালিমা পাঠ করেও কখনো এক হয় না। একটি দেশ ধ্বংস হলো, ইরাক ধ্বংস হলো, সিরিয়া ধ্বংস হলো, ইয়েমেন ধ্বংস হচ্ছে–কখনো পরের হাতে, কখনো নিজেদের হাতে। এক হওয়ার পরিবর্তে তারা নিজেকে ভেঙে ফেলছে। অন্তত এই মানুষের কাছ থেকে মুসলমানদের উচিত ঐক্যের এই মৌলিক শিক্ষাটি অর্জন করা।"

(জুমার খুতবা, ১১ মার্চ ২০২২)

এ বার্তা সুস্পষ্ট করে যে, জাতীয় ঐক্য কেবল অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায়ও এর ভূমিকা মৌলিক।

জাতীয় সংহতি বলতে এমন এক অবস্থা বোঝায়, যেখানে একটি জাতির সদস্যরা বর্ণ, ভাষা, ধর্ম কিংবা আঞ্চলিক বৈষম্য অতিক্রম করে পরস্পরের মধ্যে ঐক্য, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক আস্থার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এমন পরিস্থিতিতেই সমাজের সব শ্রেণি ও গোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে কাজ করে এবং আনন্দ–বেদনার মুহূর্তে একে অপরের পাশে দাঁড়ায়। বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন ও স্থায়ী শান্তির রহস্য এই নীতিতেই নিহিত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যখন একটি জাতি ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, তখন তা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দৃঢ় প্রত্যয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু যখন এতে বিভেদ দেখা দেয়, তখন জাতি তার শক্তি হারিয়ে ফেলে।

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রসূল–তাঁর প্রতি, যাঁর হাতে আসমানসমূহ ও জমিনের সাম্রাজ্য ন্যস্ত। তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য উপাস্য নেই; তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যুদান করেন। অতএব আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রসূল, উম্মী নবীর প্রতি–যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীর প্রতি বিশ্বাস রাখেন–ঈমান আনো এবং তাঁর অনুসরণ করো, যাতে তোমরা সৎপথপ্রাপ্ত হও।"

এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই হজরত মুহাম্মদ (সা.)–কে বিশ্বজনীন শরিয়ত–অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির জন্য নেজির স্বরূপ কুরআন মজীদ–অদান করা হয়েছিল। তিনি এরপর এমন এক অনন্য জাতীয় সংহতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যেখানে কৃষ্ণ–শ্বেত, দাস–প্রভু এবং আরব–অনারব সকলেই এক কাতারে দাঁড়িয়ে গেল–এমনকি "কেউ আর দাস রইল না, কেউ আর প্রভুও রইল না।"

তদুপরি, হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজ্জের সময় তাঁর শেষ ভাষণে পুনরায় জাতীয় ঐক্যের শিক্ষা দান করেন এবং উম্মতকে নির্দেশ দেন: "যারা এখানে উপস্থিত, তারা যেন এ বার্তা অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেয়। (সহিহ আল–বুখারি, কিতাব আল–ইলম)

জাতীয় সংহতি এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

এই যুগে ইমাম মাহদীর আগমনের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো মুসলিম উম্মাহকে পুনরায় এক স্বতন্ত্র ও ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করা। মাহদীর মাধ্যমে যে জামাআত প্রতিষ্ঠিত হবে, সে সম্পর্কে হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা করেছিলেন: "এটি হবে একটি একক জামাআত (ওয়া হিয়াল জামাত)।" তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন: "মুসলমানদের জামাআতের সঙ্গে এবং তাদের

যুগ ইমামের বাণী

"প্রবৃত্তির আবেগ ও শয়তানী প্ররোচনা থেকে কেবল একটি বিষয়ই মানুষকে বিরত রাখতে পারে যাকে বলা হয় খোদার পরিপূর্ণ পরিচয়।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

ইমামের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো।" অতঃপর তিনি সতর্ক করেন: "সকল ফিরকা থেকে দূরে সরে থাকবে-যদিও তোমাকে গাছের শেকড় খেয়ে জীবনযাপন করতে হয়-এবং সে অবস্থায় মৃত্যু উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য উত্তম।"

এই অনুযায়ী, আল্লাহ তাআলা ফার্স দেশের ঐ মহাপুরুষ-হযরত মসীহ মউদ (আঃ)-কে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন: "পৃথিবীর মুসলমানদের একত্র করো, যাতে তারা এক ধর্মে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।"

ন্যায় ও সাম্যতা ঐক্যের ভিত্তি: বিশ্ব-ঐক্য: শান্তির চাবিকাঠি

হুযুর আনোয়ার বলেন:

if these measures are taken then it will soon become apparent that the existing conflicts will end and be replaced by peace and mutual respect, provided true justice is practiced and each country realises its responsibility. It is with great regret that I must say that, although it is an Islamic teaching, the Islamic countries have been unable to unite amongst themselves.'

"যদি এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তবে শীঘ্রই প্রতীয়মান হবে যে বর্তমান বিরোধসমূহ দূর হয়ে যাবে এবং তাদের স্থলে শান্তি ও পারস্পরিক সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে-শর্ত এই যে প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেক দেশ তার দায়িত্ব উপলব্ধি করে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, যদিও এটি এক সুস্পষ্ট ইসলামী শিক্ষা, তবুও ইসলামী দেশসমূহ নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে সক্ষম হয়নি।"

সর্বজনীন নির্দেশনা

২০১৯ সালে ফ্রান্সের ২৭তম জলসায় সম্মানীয় নাগরিক ও অতিথিদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ার বলেন:

A true Muslim is a person who is himself peaceful and who strives to establish peace and harmony in the world.

"একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি, যিনি নিজে শান্তিপ্রিয় এবং বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট থাকেন।"

(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১৪ই জুলাই, ২০২০)

অনুরূপভাবে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ৪ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রেস কনফারেন্সে হুযুর আনোয়ার বলেন:

Islam's message of peace is universal, which is why our motto is Love for All, Hatred for None.

ইসলামের শান্তির বার্তা সর্বজনীন; সেই কারণেই আমাদের মূলনীতি হলো-সবার প্রতি ভালোবাসা, কারও প্রতি ঘৃণা নয়।

For decades, he has been advising Muslims that unity is the only way to free the Muslim world from the shackles of discord.

হযরত খলিফা কয়েক দশক ধরে মুসলমানদের উপদেশ দিয়ে আসছেন যে, মুসলিম বিশ্বকে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার একমাত্র পথ হলো ঐক্য।

২০২৫ সালের ১৩ জুন প্রদত্ত তাঁর জুমার খুতবায়, ইরান-ইসরায়েল সংঘাতের প্রেক্ষাপটে দোয়ার প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে হযরত খলিফাতুল-মসীহ আল খামিস (আইদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল-'আজীজ) বলেন:

"এই সময়ে আমি আবারও-যেমনটি প্রায়শই বলে থাকি-বলতে চাই যে বিশ্বের সামগ্রিক পরিস্থিতির জন্য নিয়মিত দোয়া করে যেতে হবে। যুদ্ধ বিস্তারের সম্ভাবনা দিন দিন বাড়ছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের এ-যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করেন; কারণ ইসরায়েল এখন ইরানের উপর আক্রমণ চালিয়েছে এবং যুদ্ধের এই অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক রূপ ধারণ করেছে।

ইসরায়েলি সরকার এখন একের পর এক প্রতিটি মুসলিম দেশকে ক্ষতি করারই চেষ্টা করবে। অথচ মুসলিম দেশগুলো ঘুমিয়ে আছে; তারা নিজেদের উন্নয়ন প্রকল্প ও নানা অগ্রাধিকারেই ডুবে রয়েছে এবং কী ঘটছে তা বুঝতে পারছে না।

মুসলমানদের না আছে কোনো আমল, না আছে দোয়ার প্রতি মনোযোগ। এমন অবস্থায় তাদের উপর কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি নেমে আসতে পারে-তা তারা কল্পনাও করতে পারে না। আল্লাহ তাদের প্রজ্ঞা দান করুন, এদিকে মনোযোগী হওয়ার তাওফীক দিন এবং তারা যেন নিজেদের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা করে।

এমন হওয়া উচিত নয় যে অমুক ব্যক্তি অমুক ফিরকার, তমুক অন্য ফিরকার-তাই আমরা তাদের সাহায্য করছি না। সব মুসলিম দেশই বিপদের মধ্যে রয়েছে; কারণ কুফর এক জাতির ন্যায় হয়ে গেছে-'আল-কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদাহ'। কাফির জাতিসমূহ এক মিল্লত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, আর এখন মুসলমানদেরও একক উম্মাহ হয়ে ওঠতেই হবে-তবেই তাদের নাজাত। এর বিকল্প নেই। আল্লাহ প্রত্যেক নিরপরাধ ও প্রতিটি নিপীড়িতকে বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে দোয়ার প্রতি গভীর মনোযোগী হওয়ার তাওফীক দিন। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন।"

হযরত খলিফা, আল্লাহ তাআলা যেন তাঁকে তাঁর মহাশক্তিশালী সাহায্যে শক্তিশালী করেন, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রদত্ত খুতবা জুমায় বিশেষভাবে দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন-

"আমি যেমনটি বারবার দোয়ার জন্য বলে থাকি-বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে, মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে-বিশেষ করে ফিলিস্তিনিদের জন্য এবং সামগ্রিকভাবে মুসলিম বিশ্বের জন্য বেশি করে দোয়া করো। বাহ্যিকভাবে এমন মনে হতে পারে যে মানুষ খুশি, এই ভেবে যে হয়তো যুদ্ধবিরতি হলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে; কিন্তু বাস্তবে অবস্থা দিন দিন আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। নতুন আমেরিকান প্রেসিডেন্টের নীতি ও পরিকল্পনা জুলুমের আরেক চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আগে আমেরিকানরা বলত যে বাইরের বিশ্বে হস্তক্ষেপ করা তাদের দেশের জন্য বিপজ্জনক, কিন্তু এখন তো তা সমগ্র বিশ্বের জন্যই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ তাআলা ফিলিস্তিনিদের প্রতি রহম করুন, বিশ্বের প্রতিও রহম করুন এবং এসব বিপদ থেকে রক্ষা করুন। আরব দেশগুলোর এখনো উচিত চোখ খুলে দেখা এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। এর কোনো বিকল্প নেই। অন্যথায় শুধু ফিলিস্তিন নয়, অন্যান্য আরব দেশগুলোকেও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।"

(আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)

আরেক উপলক্ষে জাতীয় ঐক্য সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে হযরত খলিফা, আল্লাহ তাআলা যেন তাঁকে শক্তিশালী করেন, বলেন যে আনুগত্যই একটি জাতির ঐক্যের মৌলিক একক।

(ওয়াকিফিনে নও ইউকে-এর বার্ষিক ইজতেমার সমাপনী ভাষণ থেকে, আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ৩০ মে ২০২৪)

আহমদীয়া জামায়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

এই খোদা প্রদত্ত জামায়াতের লক্ষ্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত আমীরুল-মু'মিনীন (আইদাহুল্লাহু তা'আলা) বলেন:

"আমি যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছি-এগুলিই সেই উদ্দেশ্য যার জন্য এ জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলোর পূর্ণতার জন্য আমাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, যেমন প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) বহুবার ঘোষণা করেছেন। এসব লক্ষ্য ত্যাগ দাবি করে। যেমন আমি বলেছি, কেবল কাহিনি পড়ে বিপ্লব আসে না; প্রতিটি আহমদিয়া নারীকে হাজেরার মতো

মহান আল্লাহর বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararbhita (Assam)

হতে হবে, প্রতিটি আহমদিয়া যুবককে ইসমাইলের মতো হতে হবে এবং প্রত্যেক দেশ, জাতি ও বংশের প্রতিটি আহমদিকে এ মান প্রদর্শন করতে হবে। তবেই আমরা বিশ্বে প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারব।" (জুমার খুতবা, ৩১ জুলাই ২০২০)

খিলাফতে আহমদিয়া শতবর্ষ জুবিলি উপলক্ষে বার্তা

খিলাফতে আহমদিয়ার শতবর্ষ জুবিলি উপলক্ষে হযরত খলিফাতুল-মসীহ আল খামিস (আইদাহুল্লাহু তা'আলা) বিশ্বব্যাপী আহমদিয়া জামায়াতকে উদ্দেশ করে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বার্তায় বলেন:

"এটি আল্লাহর তাকদীর। এটি সেই ঈশ্বরেরই প্রতিশ্রুতি-যিনি কখনো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন না-যে প্রতিশ্রুত মসীহের (আঃ) প্রিয়জনরা, যারা কুদরতে সানিয়্যার সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত, তারা পৃথিবীর উপর বিজয়ী হবে; কারণ আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন। আল্লাহ আমাদের সঙ্গেও আছেন। আজ কুদরতে সানিয়্যার একশ বছর পূর্ণ হলো, এবং প্রতিদিন আমরা এই প্রতিশ্রুতির পূর্ণতার নতুন নতুন রূপ প্রত্যক্ষ করছি। অতএব প্রতিটি আহমদির কর্তব্য হলো নিজের সকল সামর্থ্য নিয়ে প্রতিশ্রুত মসীহের (আঃ) মিশন পূরণের জন্য কুদরতে সানিয়্যার সাথে অটলভাবে সংযুক্ত থাকা। আজ রাসূলের (সা.) মসীহের মিশন প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বকে ঐক্যের মালায় গাঁথার একমাত্র উপায় হলো খিলাফতে আহমদিয়ার সঙ্গে দৃঢ় সম্পৃক্ততা। এর মাধ্যমেই খোদার বান্দারা পৃথিবীতে এক মহান বিপ্লব আনবে। আল্লাহ প্রতিটি আহমদিকে অটল ঈমান দান করুন এবং এ চমৎকার সত্য পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার তাওফীক দিন। আমীন।"

(খিতাবাত, হযরত মির্জা মসরুর আহমদ, খলিফাতুল-মসীহ্ আল খামিস (আ.) পৃষ্ঠা ১৮-২০, ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনস, যুক্তরাজ্য)

আহমদিদের প্রতি দিকনির্দেশনা

জাতীয় ঐক্যের বিষয়ে হযরত খলিফাতুল-মসীহ্ আল খামিস (আইদাহুল্লাহু তা'আলা) বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি আহমদিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেগুলোর কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো:

জামায়াত ও ঐক্য

"জামায়াত হওয়ার বরকতই হলো-একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, ঐক্য সৃষ্টি হয়। এটাই প্রতিশ্রুত মসীহের (আঃ) আগমনের উদ্দেশ্য ছিল, এবং মাহদি মাও'দের আগমনের লক্ষ্যও ছিল-মুসলমানদের এক হাতে সমবেত করা এবং এক উম্মাহে পরিণত করা।" (জুমার খুতবা, ২৬ অক্টোবর ২০১৮)

জামায়াত ও একত্ব

"আল্লাহর হাত জামায়াতের উপর থাকে। এ কথাই আমরা হজরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণীতেও পাই। যতক্ষণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, না আল্লাহকে পাওয়া যাবে, না অন্য কোনো সফলতা আসবে। আল্লাহ তাদেরকেই দেন, এবং তাওহীদের প্রকৃত উপলব্ধি তারাই লাভ করে-যারা ঐক্যবদ্ধ।" (জুমার খুতবা, ৫ ডিসেম্বর ২০১৪)

বায়জমা'ত নামাজ ও ঐক্য

"আপন-আপনাকে দেখা-সাক্ষাৎ অবশ্যই কিছু প্রভাব ফেলে, কিন্তু তা তাদের জন্য যাদের ঈমান খুব দুর্বল। প্রকৃত ঈমান দাবি করে-পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য মসজিদে আসো। আল্লাহ যখন তোমাদেরকে মসজিদ দান করেছেন, তোমরা সমবেত হয়ে এখানেই ঐক্যের সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে।" (জুমার খুতবা, ১১ অক্টোবর ২০১৯)

"এই যুগে আল্লাহ হজরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রকৃত সেবক প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদিকে পাঠিয়েছেন, যিনি আমাদেরকে ইবাদত ও নামাজের প্রকৃত উপলব্ধির দিকে পথ দেখিয়েছেন। অতএব যদি আমরা দাবি করি যে আত্মিক উন্নতি ও ঐক্যের প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা তাঁর (সা.) এই নিযুক্ত সেবককে গ্রহণ করেছি।

(জুমার খুতবা, ২০ জানুয়ারি ২০১৭)

শূরা পদ্ধতি

"কিছু বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরামর্শ গ্রহণ করার অভ্যাস প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে সঠিক পথে চলার জন্য, পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করার জন্য এবং উম্মাহর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করে।" (জুমার খুতবা, ১২ মে ২০২৩)

মা'রূফ সিদ্ধান্ত ও ঐক্য

"মা'রূফ সিদ্ধান্ত কী-তার ব্যাখ্যা দেওয়া কোনো ব্যক্তির কাজ নয়। মা'রূফ সিদ্ধান্ত সেটিই যা কুরআন, সুন্নাহ, হাদীস এবং এ যুগের হাকাম ও আদলের নির্দেশনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর মাধ্যমেই জামায়াতের ঐক্য সংরক্ষিত থাকে। এটাই সেই উদ্দেশ্য যার জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) প্রেরিত হন-ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং আন্তরিক ও অনুগত এক জামায়াত গঠনের জন্য।" (জুমার খুতবা, ২ নভেম্বর ২০১৮)

অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা জাতীয় ঐক্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ প্রসঙ্গে হযরত খলিফাতুল-মসীহ আল খামিস (আইদাহুল্লাহু তা'আলা) বলেন: "পরিস্থিতি কেবল এখানে নয়, আমেরিকাতেও তাই-এবং পুরো পৃথিবীতেই একই অবস্থা। যেমন বলেছি, প্রকৃতির আইন শেষ পর্যন্ত নিজের কাজ করে। যখন মানুষ এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে তারা ঋণ শোধ করতে অক্ষম, তখন ব্যাঙ্কগুলো উপলব্ধি করল-'এসব তো আমাদের টাকা ছিলই না; এগুলো অন্যদের টাকা।' ফলে তারা ঋণ দেওয়া বন্ধ করে দেয়-অকার্যকর কাজে যেমন, উৎপাদনশীল কাজেও তেমন। এর ফলেই পুরো অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হলো; এবং যেহেতু অর্থনীতি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল, তাই পুরো বিশ্বই এই সংকটে জড়িয়ে পড়ল।"

তিনি বিশ্বকে সতর্ক করে বলেন:

"এ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের মূল কারণ এখনও বোঝা হয়নি। সব ক্ষমতার অধিকারী এবং রিযিকদাতা আল্লাহকে প্রকৃতভাবে না চেনা-অথবা তাঁর অধিকার যথাযথভাবে আদায় না করা-এটিও এক ধরনের অস্বীকার। যেসব জাতি বা রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী-অথবা সম্প্রতি শক্তিশালী ছিল-তারা খুব কমই লক্ষ্য করে যে-যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন-তিনিও তাঁর বিধান অনুযায়ী বিশ্ব পরিচালনা করেন।" তিনি আরও বলেন:

"এই মুহূর্তে বিশ্বকে সতর্ক করা আমাদের আহমদিদের দায়িত্ব-যে এসব বিপর্যয় ও সংকটের মূল কারণ হলো আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাওয়া, সৃষ্টির হকের প্রতি বেখেয়ালি থাকা এবং অন্যের সম্পদের প্রতি লোভী দৃষ্টি দেওয়া। স্থায়ী সমাধান চাইলে এসব বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের বেইলআউট বা আর্থিক সহায়তা স্থায়ী সমাধান নয়; কারণ এই অর্থ তো সেই জনগণেরই পকেট থেকে আসে-যারা ইতোমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আজ মুসলিম দেশগুলোরও একই অবস্থা; তারা কুরআন যেখানে দিকনির্দেশ দিয়েছে-সেদিকে না গিয়ে দুনিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকেছে।"

তিনি আরও যোগ করেন: "কিন্তু এর জন্য বিশ্বকে আল্লাহর সেই আহ্বানওশ্রবণ করতে হবে-যা তাঁর মসীহ ও মাহদির মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এর ব্যতীত এই যুগে নেই কোনো নাজাত, নেই কোনো নিরাপত্তা, নেই কোনো নিশ্চয়তা।"

"আল্লাহ বিশ্বমানবকে তাওফীক দিন যেন তারা এই নূরের পরিসরে প্রবেশ করে-যাতে আল্লাহর অবাধ্যতার ফলে যে বিশৃঙ্খলা দুনিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে-তা থেকে তারা রক্ষা পায়। কেননা এখন মানুষকে আল্লাহর সঠিক পরিচয় দেওয়া, তাঁকে পৌঁছে দেওয়া-মানুষকে প্রকৃত ইবাদতকারী ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রকৃত অনুগত বানানোর একমাত্র উপায় হলো এই খোদা-প্রদত্ত ব্যবস্থা। আল্লাহ করুন-বিশ্ব এ মৌলিক নীতিকে চিনে নেয়।"(জুমার খুতবা, ৩১ অক্টোবর ২০০৮)

জাতীয় ঐক্যের নিশ্চয়তা হিসেবে খিলাফত

জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রসঙ্গে হযরত খলিফাতুল-মসীহ্

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং অনুধাবন করে, সে ধনী; তার কোনও দারিদ্রের ভয় নেই।

(সুনান সাঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Wasia Begum, Harhari, Murshidabad

যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family Bithari, 24 PGS (N)

আল খামিস (আইদাহুল্লাহু তা'আলা) বলেন:

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্যের উদ্দেশ্যগুলোর একটি হলো-ঐক্যের মালায় গাঁথা থাকা, আর এটি খিলাফত ছাড়া সম্ভব নয়। অন্যান্য মুসলমানরা নামাজ পড়লেও একতা নেই; তাদের অন্তর ছিন্ন। একই মাযহাবের হয়েও খুঁটিনাটিতে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। আলেমরা নিজেদের মিম্বার, নিজ নিজ স্বার্থ-এখন তো পাকিস্তানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও-একে অপরের সাথে লড়াই করে। তাদের অনুসারীরাও সেই অবস্থায় পড়ে।"

(জুমার খুতবা, ২৫ মে ২০১৮)

তিনি আরও বলেন:

"আহমদিদের উপর আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ যে তারা শুধু হাদীয়ে কামিল (সা.)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্তই নয়, বরং এ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদির (আঃ) জামায়াতের অংশ হতে পেরেছে-যার মধ্যে একটি ঈশ্বরপ্রদত্ত ব্যবস্থা-একটি খিলাফতের নবুধস-স্থাপিত রয়েছে। তোমাদের হাতে একটি দৃঢ় বন্ধন রয়েছে-যা ভাঙার নয়। তবে মনে রেখো-এ বন্ধন ভাঙবে না ঠিকই, কিন্তু তোমরা যদি নিজের হাত আলগা করো-তবে তোমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। আল্লাহ তোমাদের সবাইকে রক্ষা করুন। অতএব সর্বদা মনে রেখো-'আল্লাহর রশি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো'-এবং জামায়াতের ব্যবস্থার সাথে অটলভাবে লেগে থাকো। এখন এটি ছাড়া তোমাদের অস্তিত্ব সংকটে।" (আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ অক্টোবর ২০০৩)

খলিফা-এ-ওয়াক্তের দিকনির্দেশনা ও ঐক্য

ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন, নৈতিক সংস্কার এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে খলিফা-এ-ওয়াক্তের কর্মসূচির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (খুতবা জুমা, ২০ নভেম্বর ২০১৫)

খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হযরত খলিফা, আল্লাহ তাআলা যেন তাঁকে তাঁর মহাশক্তিশালী সাহায্যে শক্তিশালী করেন, জামাতের সদস্যদের উদ্দেশে প্রদত্ত তাঁর প্রথম লিখিত বার্তায় খিলাফতের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার বরকতসমূহ এই ভাষায় তুলে ধরেন-

"কুদরতে সানিয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান নিয়ামত, যার উদ্দেশ্য হলো জামাতকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং বিভেদ থেকে রক্ষা করা। এটি সেই সুতো, যার মাধ্যমে জামাত মুক্তার মতো গাঁথা রয়েছে। যদি মুক্তাগুলো ছড়িয়ে থাকে, তবে সেগুলো যেমন নিরাপদ থাকে না, তেমনি সুন্দরও দেখায় না; এক সুতোয় গাঁথা মুক্তাগুলোই কেবল সুন্দর ও নিরাপদ হয়। কুদরতে সানিয়া ছাড়া সত্য ধর্ম কখনোই উন্নতি করতে পারে না। অতএব এই কুদরতের সঙ্গে পূর্ণ আন্তরিকতা, ভালোবাসা, আনুগত্য, বিশ্বস্ততা ও ভক্তিভরে সম্পর্ক স্থাপন করো। খিলাফতের প্রতি আনুগত্যের চেতনাকে স্থায়ী করো এবং তার প্রতি এমন গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করো, যেন এর তুলনায় অন্যান্য সব সম্পর্ক গৌণ বলে প্রতীয়মান হয়। ইমামের সঙ্গে সংযুক্তিতেই সকল বরকত নিহিত রয়েছে, এবং এটিই সকল প্রকার ফিতনা ও পরীক্ষার মোকাবিলায় তোমাদের জন্য একটি ঢালস্বরূপ।

সুতরাং যদি তোমরা উন্নতি করতে চাও এবং বিশ্বের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চাও, তবে আমার উপদেশ ও আমার বার্তা এটিই-খিলাফতের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়ে যাও। আল্লাহর এই রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। আমাদের সমস্ত উন্নতির নির্ভরতা কেবল খিলাফতের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার মধ্যেই নিহিত। আল্লাহ তোমাদের সকলের সহায়ক ও সাহায্যকারী হোন এবং খিলাফতে আহমদিয়ার সঙ্গে পূর্ণ আনুগত্য ও গভীর সংযুক্তির তাওফিক দান করুন।" (আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩ মে ২০০৩)

খিলাফত ও আনুগত্যের ভূমিকা

মে ২০২৪ সালে যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত ওয়াকফে নও ইজতেমায় হযরত খলিফা বলেন-

"আনুগত্যই হলো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার প্রধান মাধ্যম।"

এই বক্তব্যটি একটি মৌলিক সত্যকে স্পষ্ট করে যে কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য তখনই টিকে থাকতে পারে, যখন তারা একটি সুসংগঠিত নেতৃত্বের অধীনে আনুগত্যশীল থাকে। অতএব খিলাফতের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার পালন করা অপরিহার্য, যাতে এক ইমামের নেতৃত্বে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশ্বের মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়।

(খুতবা জুমা, ৬ জুন ২০১৪)

আন্তর্জাতিক ঐক্য

উল্লেখযোগ্য যে হযরত খলিফাতুল-মসীহ্ আল খামিস (আইদাহুল্লাহু তা'আলা) আন্তঃধর্মীয় শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য বৈশ্বিক পর্যায়ে "National Peace Symposium" আয়োজন করেন, সচেতনতা সৃষ্টি করেন এবং Pathway to Peace-এর মতো বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ শুরু করেন।

তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ World Crisis and the Pathway to Peace, যেখানে বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট ও সরকারি অঙ্গনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ, বিশ্বনেতাদের প্রতি চিঠি এবং সাক্ষাৎকারসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে-পঞ্চম খিলাফতের আন্তর্জাতিক ঐক্যে অবদানের এক অসাধারণ নিদর্শন।

জাতীয় ঐক্য বিষয়ে হুযুর আনোয়ারের প্রচেষ্টা এবং অ-আহমদিদের অভিমত

জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হযরত খলিফাতুল-মসীহ্ আল খামিস (আইয়েদাহুল্লাহু তা'আলা)-এর অসাধারণ প্রচেষ্টা ও প্রজ্ঞাময় দিকনির্দেশনা অ-আহমদিদের দ্বারাও স্বীকৃত। তাদেরই একজন, এক খ্রিষ্টান বিশপ, যিনি ৪ ডিসেম্বর ২০১২ ব্রাসেলসের ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে তাঁর সম্মানে আয়োজিত এক সংবর্ধনায় বলেন:

"এই ব্যক্তি জাদুকর নন, কিন্তু তাঁর কথাগুলো জাদুর মতো প্রভাব ফেলে। তাঁর কণ্ঠস্বর মৃদু, কিন্তু মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শব্দগুলো অসাধারণ শক্তি, মহিমা ও প্রভাব বহন করে। আমি আমার জীবনে এমন সাহসী মানুষ দেখিনি। যদি পৃথিবীতে আপনার মতো মাত্র তিনজন মানুষ পাওয়া যায়-তবে বৈশ্বিক শান্তির ক্ষেত্রে-অবিশ্বাস্য এক বিপ্লব মাসে নয়, বরং কয়েক দিনের মধ্যেই সংঘটিত হতে পারে এবং পৃথিবী শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের এক আদর্শ উদ্যান হয়ে উঠতে পারে। আমি ইসলামের প্রতি কোনো ভালো ধারণা পোষণ করতাম না-কিন্তু আপনার বক্তব্য ইসলামের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দিয়েছে।" (আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ৪ জানুয়ারি ২০১৩)

একইভাবে, মাল্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্নল্ড ক্যাসোলা-যিনি ৩০টিরও বেশি গ্রন্থের রচয়িতা এবং ইতালীয় পার্লামেন্টের সাবেক সদস্য-বলেন: "সম্মেলনের আয়োজন ছিল সর্বোচ্চ মানসম্মত; ক্ষুদ্রতম বিষয়েও বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছিল, এবং কোথাও কোনো ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্বের যে ধারণা আহমদিয়া মুসলিম জামাত উপস্থাপন করে এবং তাদের মূলনীতি 'সবার প্রতি ভালবাসা, কারও প্রতি ঘৃণা নয়'-এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি জাতিগত ও ধর্মীয় বৈষম্যের সকল রূপ দূর করে সমগ্র মানবজাতিকে এক সুতোয় গেঁথে দেয় এবং মানবসমাজের সংহতি নিশ্চিত করে। হযরত খলিফাতুল-মসীহ (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন)-এর ভাষণে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চলমান প্রচেষ্টাগুলোর সুস্পষ্ট প্রতিফলন ছিল। বাস্তবে, যারা বিশ্বে শান্তি ও সহনশীলতা খোঁজেন, তাদের সকলের জন্য আহমদিয়া মুসলিম জামাত একটি গুরুত্বপূর্ণ সংলাপের প্ল্যাটফর্ম প্রদান করছে, এবং রাজনৈতিক পর্যায়েও এ বিষয়টি অনন্যভাবে উপস্থাপন করছে।" (আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ৪ জানুয়ারি ২০১৩)

মাল্টার আরেক অতিথি, দুইটি অনুষ্ঠান-এর প্রযোজক ও উপস্থাপক মি. আইভান বার্তোলো বলেন:

মহানবী (সা.)-এর বাণী

অতিথিকে গৃহের দরজা পর্যন্ত গিয়ে বিদায় জানানোও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। (সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun, From Mirza Enayetulla Sb Harhari, Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত এবং জামাতের সঙ্গে যারা সম্পর্ক স্থাপন করে, আল্লাহ তা'লা তাদের পথ-প্রদর্শন করেন।

-খুতবা জমা ২৪ মে ২০১৯

দোয়াপ্রার্থী: Noor Jahan Begum, Kolkata

"সত্যিই, হযরত খলিফাতুল-মসীহ বিশ্বশান্তির এক মহান দুত, এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব, মিশন এবং শান্তি ও বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অব্যাহত প্রচেষ্টা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।" (আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ৪ জানুয়ারি ২০১৩)

স্পেনের আরেক সংসদ সদস্য, টলেডো প্রদেশের কংগ্রেসওম্যান মিস রোসিও লোপেজ লিখেছেন:

"এই অনুষ্ঠান বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের স্থায়ী স্মৃতি রেখে গেছে। ব্রাসেলসের অনুষ্ঠানটি এমন একটি গতিশীল জামাতের পরিচয় তুলে ধরেছে যারা নিয়ত গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত। হযরত মির্জা মাসরূর আহমদ-এর নেতৃত্বে এবং 'সবার প্রতি ভালবাসা, কারও প্রতি ঘৃণা নয়' মূলনীতির অধীনে, বিভিন্ন জাতির আহমদিরা এক সত্ত্বায় মিশে গেছে। নিজের স্বার্থে মত্ত এই পৃথিবীতে, যেখানে শান্তি ও ভালবাসার বার্তা অত্যন্ত প্রয়োজন, সেখানে আপনাদের সম্পর্কে জানতে পারা সত্যিই এক বিরাট সৌভাগ্য। আপনার ইমামের সাথে কয়েকটি কথা বিনিময় করা বা সহিংসতার বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনা-এর চেয়ে সুন্দর আর কী হতে পারে? আপনাদের আদর্শকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি। মানবাধিকার পুনরুদ্ধার ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এই আল্লাহতাআলার মানুষের প্রতিটি কথার সঙ্গে আমি একমত। ধর্মের ভিত্তিতে নির্যাতনকে আমি সর্বদা নিন্দা জানিয়ে যাব। আল্লাহ আপনাদের প্রতি সদা করুণাময় হোন।" (আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ৪ জানুয়ারি ২০১৩)

বুর্কিনা ফাসোর অধ্যাপক ড. জিয়ালো জাঁ-একজন সুপরিচিত চক্ষু বিশেষজ্ঞ, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং কর্মরত সেনা কর্নেল-যিনি আমাদের চক্ষু ইনস্টিটিউটেও আসেন, প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। তিনি বলেন: "এটি ছিল আমার প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ। আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে এই বিষয়টি যে হাজারো মানুষ এক স্থানে এক উদ্দেশ্যে-একজন ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে-সমবেত হয়েছে। সবাই একতাবদ্ধ, সবার লক্ষ্য একই ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল, জাতি, পেশা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এক স্থানে, এক হাতে, এক উদ্দেশ্যে একত্রিত-এটি এক অতুলনীয় দৃশ্য।"

(জুমার খুতবা, ৪ আগস্ট ২০২৩)

হাইতি থেকে আগত ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি মি. জোয়েল তুরেন বলেন:

"সংস্কৃতি, বর্ণ ও জাতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও সবাই এমনভাবে মেলামেশা করছিল যেন তারা এক পরিবারের সদস্য। বিভিন্ন দেশের মানুষ প্রতিদিন একই খাবার একসাথে গ্রহণ করছিল।"

(জুমার খুতবা, ৪ আগস্ট ২০২৩)

একইভাবে, হাইতির বিচারিক পুলিশের প্রতিনিধি পিয়ের ইমানুয়েল বলেন: "আহমদিয়া মুসলিম জামাত ইন্টারন্যাশনাল আয়োজিত যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা সালানায় অতিথিদের মধ্যে থাকতে পারা ছিল এক বিরাট সম্মান। একজন খ্রিস্টান হিসাবে এই জলসায় অংশগ্রহণ আমাকে শুধু ইসলাম নয়, বরং সার্বিকভাবে ধর্ম সম্পর্কে জানার সুযোগ দিয়েছে। বিভিন্ন বিশ্বাস, সংস্কৃতি, ভাষা ও পটভূমির মানুষ-তাদের স্বতন্ত্র রীতিনীতি সহ-এক রঙে রঙিন হয়ে ছিল। এ এক বিস্ময়কর দৃশ্য, নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং অনুসরণযোগ্য।"

(জুমার খুতবা, ৪ আগস্ট ২০২৩)

কাজাখস্তানের একজন রাজনৈতিক নেতা, যিনি জলসায় অংশ নেন, বলেন: "এই পরিবেশ দেখে, আপনাদের কথা শুনে ও ভাষণগুলো শুনে আমি দোয়া করি যে সমগ্র বিশ্ব যেন এই জামাতের পতাকার নিচে একত্রিত হয়।" (জুমার খুতবা, ১ আগস্ট ২০০৮)

চীনের উইঘুর মুসলমানদের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। তারা বলেন: "আমরা যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেছি, এবং জামাত যেভাবে একত্রে কাজ করে তা দেখার মতো বিস্ময়কর। সকল স্বেচ্ছাসেবকের নিঃস্বার্থ সেবা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। জলসা যুবকদের মাঝে একতার মনোভাব সৃষ্টি করেছে এবং সামগ্রিকভাবে ঐক্যের পরিবেশ গড়ে তুলেছে।" (জুমার খুতবা, ৯ আগস্ট ২০১৯)

একজন জাপানি মহিলা মন্তব্য করেন: "খলিফাতুল-মসীহ বলেছেন, এটি একে অপরকে উস্কে দেওয়ার সময় নয় বরং পরস্পরের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার সময়। খলিফা বিশেষভাবে আমাদের জাপানি জনগণকে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছেন।"

(জুমার খুতবা, ২৭ নভেম্বর ২০১৫)"তুমি ঐক্যের ঝরনাধারার সঙ্গে যুক্ত-

জ্ঞানরূপী নদীধারা বহমান রাখো।"

হযরত খলিফাতুল-মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন) একবার এই বৈশ্বিক ঐক্য ও পারস্পরিক স্নেহকে আল্লাহর বিশেষ সাহায্যের নিদর্শন বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন:

"বলুন তো, দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের যে আহমদিরা বাস করেন-কী এমন শক্তি যা তাদেরকে খিলাফতের সাথে এমনভাবে যুক্ত করে? নিশ্চয়ই এটি আল্লাহর সাহায্য ও কৃপা; মানবীয় যুক্তি এ বিষয়টি ধরতে পারে না জাগতিক মানুষ এটি উপলব্ধিই করতে পারে না। জার্মানিতে এক আরব ব্যক্তি বাই'আত গ্রহণ করেছেন। তাঁর এক পরিচিত তাকে বলল, 'তুমি কি কাদিয়ানি হয়ে গেছো?' এই নবীন আহমদি উত্তর দিলেন, 'এখানে একশো আরব আছে-তুমিও একজন আরব-তবুও তোমরা একটি বিষয়েও এক হতে পারো না। অথচ আহমদিয়া জামাতে একজন ইমাম আছেন; তাঁর নির্দেশে জামাত ওঠে-বসে, এবং এ কারণেই এর কাজের ওপর আল্লাহর বরকত নাজিল হয়। এখন বলো, তোমাদের মধ্যে এমন কী গুণ আছে যা আমাকে তোমাদের কাছে টানবে এবং আমি তাদের ছেড়ে দেব। (শুক্রবারের খুতবা, ২৭ মে ২০২২)

"হে জাতির মানুষ! এ পথে এসো-সূর্য উদিত হয়েছে।

অন্ধকার উপত্যকায় কেন বসে আছো-অন্তহীন রাত-দিনে হারিয়ে?

****

১৯ পৃষ্ঠার পর.....

নিয়মিতভাবে অভিযোগ পাওয়া যায় যে দেশগুলো এই অসম ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট। ইসলাম সব ক্ষেত্রে পূর্ণ ন্যায়বিচার ও সমতার শিক্ষা দেয়।"

(World Crisis and the Pathway to Peace, Address ৪, পৃ. ৭৫-৭৬)

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সমতার চিরন্তন, মহিমান্বিত এক বার্তা দান করেছেন সমগ্র মানবজাতির প্রতি রহমত, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে। আজ যদি মানবতার মধ্যে ঘৃণার অচলয়াতন প্রাচীর ভেঙে ফেলতে হয় এবং পারস্পরিক শান্তি, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তবে আমাদের নিজেদের জীবনে এই শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং বিশ্বকে তা জানাতে হবে।

হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আই.) আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন:

"আমরা প্রকৃত আহমদী তখনই হব, যখন আমাদের আমল সর্বত্র সর্বোৎকৃষ্ট নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটাবে-যখন আমাদের উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে আমরা আমাদের পাড়া, শহর ও দেশে ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশ করব। কলহ, বিবাদ, চোগলখুরি, অন্যকে হীনজ্ঞান করা, কঠোরতা বা উপকার স্মরণ করিয়ে দেওয়া-এসব থেকে দূরে থাকতে হবে। বরং উচ্চ নৈতিক মান অর্জন করতে হবে। কোরআন বারবার আমাদেরকে উত্তম নৈতিকতা ও সৎকর্মের দিকে আহ্বান জানায়।"

(খুতবা জুমা, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪)

"কর্মেই সাফল্য; মৃত্যুতেই জীবন-

বিপদের নদীতে ঝাঁপাও, ভয় কোরো না তরঙ্গকে।"

(কালামে মাহমুদ)

আল্লাহ আমাদের সকলকে এই শিক্ষাগুলো অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

****

যুগ ইমামের বাণী

যার মধ্যে ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান নেই, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের পরোয়া করেন না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ali Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (s)

যুগ খলীফার বাণী

যদি তোমরা ইহকাল ও পরকালের সফলতা এবং মানুষের মন জয় করতে চাও, তবে পবিত্রতা অবলম্বন কর, নিজেকে পরিছন্ন রাখ এবং নিজের উত্তম আচরণের নমুনা প্রদর্শন কর। তবেই তোমরা সফলকাম হবে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১লা জানুয়ারী, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

ইসলামে সাম্যের শিক্ষা

-হাফিয সৈয়্যদ রসুল, মুবাল্লিগ নশর ইশাআত

সারা বিশ্বে ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) হিসেবে পালন করা হয়, কারণ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা (UDHR) গৃহীত হয়েছিল। এতে ত্রিশটি অনুচ্ছেদ রয়েছে, যা প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। তবে জাতিসংঘ ক্রমশই তার নিজস্ব নীতি ও বিধিনিষেধ বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। এর ফলস্বরূপ বিশ্বব্যাপী অধিকাংশ দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত রয়েছে, এবং আজও অসংখ্য মানুষ তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। যদি জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত অনুচ্ছেদসমূহ ন্যায়সংগত ও সমতা-ভিত্তিকভাবে প্রয়োগ না করা হয়, তবে জাতিসংঘ নিজেও অকর্মণ্য প্রমাণিত হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন:

"প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে, কয়েকটি দেশের নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যতে বিশ্বের সকল জাতির মাঝে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে 'লীগ অব নেশনস্' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মূল লক্ষ্য ছিল, বিশ্বজুড়ে শান্তি বজায় রাখা এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধ প্রতিহত করা। দুঃখজনকভাবে, এর সংবিধান ও প্রস্তাবাবলীতে এমন কিছু ত্রুটি এবং দুর্বলতা ছিল, যা সমভাবে সকল মানুষ ও সকল জাতির অধিকার সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়। আর এ কারণেই অনেক দেশ একের পর এক 'লীগ' থেকে সরে যেতে আরম্ভ করে। এতে বিরাজমান সেই বৈষম্যের কারণে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি অর্জন সম্ভব হয় নি। 'লীগের' প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং এ পৃথিবীকে সরাসরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে ঠেলে দেয়। আমরা সবাই এই বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে অবহিত। এতে বিশ্বজুড়ে প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল, যাদের অনেকেই ছিল বেসামরিক নিরীহ জনসাধারণ। এই যুদ্ধ বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সাব্যস্ত হওয়া উচিত ছিল। এটি ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে সকল পক্ষের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করে এমন বিচক্ষণ নীতি নির্ধারণের উপলক্ষ হওয়া উচিত ছিল, যা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি উপকরণ সাব্যস্ত হতে পারতো। তৎকালীন বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়, আর এভাবে 'জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু অচিরেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায়, যে মহান লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল তা আজও অর্জিত হয় নি। ইদানিং কয়েকটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অকপট বিবৃতি নিঃসন্দেহে এর ব্যর্থতা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে।

(বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ, পৃ: ৭৫)

ইসলাম-যে ধর্ম চৌদ্দ শতাব্দী আগে সকল মানুষের মৌলিক ও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল

সৃষ্টির সূচনা থেকেই সত্যপরম সৃষ্টিকর্তা ধারাবাহিকভাবে নবীদের প্রেরণ করে আসছেন, যাতে তাঁরা আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতার শিক্ষা দিয়ে মানবজাতিকে এমনভাবে প্রশিক্ষিত করেন যে সমাজের সকল শ্রেণি সমান অধিকার ভোগ করতে পারে। এ উদ্দেশ্য তখনই বাস্তবায়িত হতে পারে যখন মানুষের মধ্যে refinement, সৌজন্য, সাহস, সহনশীলতা, সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলি বিকশিত হয়। সে অনুযায়ী, বিশ্বের সকল ধর্মীয় নেতাই একবাক্যে শিক্ষা দিয়েছেন যে সত্য বলা পুণ্য এবং মিথ্যা বলা পাপ; ন্যায়পরায়ণতা সৎকর্ম এবং জুলুম অন্যায়; পারস্পরিক স্নেহমমতা মানবিক মর্যাদা এবং বিদ্বেষ পশুসুলভ বৈশিষ্ট্য; দান-খয়রাত উত্তম কাজ এবং চুরি-ডাকাতি মন্দ।

তবুও এসব শিক্ষার মধ্যে ইসলামই সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে: بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"আমি উত্তম নৈতিকতা পরিপূর্ণ করতে প্রেরিত হয়েছি।" সন্দেহ নেই যে তিনি নৈতিক উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং প্রতিটি গুণকে তার সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত করেছেন। তাই আল্লাহ তা'লা নিজেই আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন: وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

"নিশ্চয়ই তুমি মহান নৈতিকতার সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত।"

(কলম ৬৮:৫)

মক্কী যুগের শুরুতে যখন হযরত আবু জর গিফারি (রা.) তাঁর ভাইকে নতুন আগত নবীর শিক্ষা অনুসন্ধান করতে পাঠান, তখন তিনি ফিরে এসে বলেছিলেন:

رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

"আমি তাঁকে দেখেছি মানুষকে উত্তম নৈতিকতার শিক্ষা দিচ্ছেন।"

প্রতিশ্রুত মসীহ, হযরত মির্জা গুলাম আহমদ (আ.) এই সত্যকে তাঁর কবিতায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন:

"বর্বরকে প্রকৃত মানুষে রূপান্তর করাই এক অলৌকিক বিষয়;

এইভাবেই নবুওয়তের গোপন রহস্য প্রকাশ পায়।"

(বারাহীন-এ-আহমদিয়্যাহ , রুহানী খাজাইন, খণ্ড ২১, পৃ. ১৪৪)

ইসলামের পূর্বে: বংশ ও গোত্রভিত্তিক বৈষম্য

ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াতের যুগে জাতি, বংশ ও গোত্রের ভিত্তিতে গভীর সামাজিক বিভাজন ছিল। একজন কুরাইশীকে অ-কুরাইশীর সমান মনে করা হতো না। যদি কোনো কুরাইশী অন্য গোত্রের কাউকে হত্যা করত, প্রতিদানস্বরূপ তাকে হত্যা করা হতো না; কিন্তু যদি অ-কুরাইশী কোনো কুরাইশীকে হত্যা করত তবে হত্যাকারীর গোত্রের একাধিক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। আরবরা নিজেদের ভাষাগত বিশুদ্ধতা ও বাগ্মিতার কারণে অন্যান্য জাতির তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করত, এবং সব অ-আরবকে 'আজম' বলে ডাকত- অর্থাৎ যারা ভাষাগতভাবে তাদের সমকক্ষ নয়।

সমস্ত মানবসন্তান জন্মগতভাবে সমান

ইসলাম ঘোষণা করল যে সব মানুষ জন্মগতভাবে সমান, কারণ তাদের স্রষ্টা একজন এবং তাঁদের সৃষ্টি একই প্রকৃতির অনুসারী। জন্ম কাউকে উচ্চ বা নীচ করতে পারে না; কোনো জাতি বা গোত্রে জন্ম নেওয়া কাউকে স্বভাবতই পবিত্র বা অপবিত্র, শ্রেষ্ঠ বা অধম প্রমাণ করে না। সকলেই মানুষের মর্যাদায় সমান। যদি কোনো শ্রেষ্ঠত্ব থাকে, তবে তা কেবল তাকওয়া ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে হয়। আল্লাহ তা'লা বলেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ (الحجرات:14)

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক নর ও এক নারী থেকে, এবং তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাধিক সম্মানিত, যে সর্বাধিক মুত্তাকি।"

(হুজুরাত ৪৯:১৩)

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) লিখেছেন:

"ইসলাম-পবিত্র ইসলাম- সমস্ত জাতিগত ভেদাভেদ বিলুপ্ত করেছে, কারণ সে বিশ্বে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করতে চেয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে সে একত্বের চেতনাকে প্রোথিত করেছে এবং কেবল ন্যায়পরায়ণতাকেই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি করেছে।"

(হাকায়িকউল-ফুরকান, খণ্ড ৪, পৃ. ৮)

সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৮ সালে নয়, হিজরতের ১০ম বছরে

মানবসমতার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮-এ নয়; বরং হিজরতের ১০ম বছরে জুলহিজ্জার ৯ ও ১০ তারিখে, আরাফাত ও মিনার প্রান্তরে। বিদায় হজের সময় পবিত্র নবী (সা.) সমস্ত

যুগ খলীফার বাণী

সকল প্রকার অসত্য বচন ও প্রতারণার বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া এবং নিজেদের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আহমদী যুবকদের দায়িত্ব। [হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)]

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin Sk., Barisha, Kolkata

জাহেলি প্রথা বিলুপ্ত করে মানবমর্যাদা রক্ষার এক চিরন্তন জীবনবিধান উপস্থাপন করেন। মানবসমতা ও ভ্রাতৃত্বের প্রথম বৈশ্বিক ঘোষণাপত্র তখনই প্রদান করা হয়। তিনি ঘোষণা করেন:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَلَآ اِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَاِنَّ اَبَاكُمْ وَاحِدٌ اَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلٰى عَرَبِيٍّ وَلَا لِاَحْمَرَ عَلٰى اَسْوَدَ وَلَا لِاَسْوَدَ عَلٰى اَحْمَرَ اِلَّا بِالتَّقْوٰى اَبَلَّغْتُ؟ قَالُوْا قَدْ بَلَّغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"হে লোকসকল! তোমাদের রব একজন এবং তোমাদের পিতা একজন। কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের, আর কোনো কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব নেই; আরবের ওপর অ-আরবের এবং অ-আরবের ওপর আরবেরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই-তবে তাকওয়া ব্যতীত। আমি কি বার্তা পৌঁছে দিয়েছি?

সবাই বলল, "হ্যাঁ, অবশ্যই আল্লাহর রাসূল বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন।" (মুসনদ আহমদ; সিরাত খাতামুন-নবরীন, পৃ. ৬৮৬)

জাতি ও গোত্র নিয়ে গর্ব করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়

আগের জাতি ও ধর্মসমূহে বংশ বা ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে আত্মগরিমা প্রচলিত ছিল। হিন্দু সমাজের বর্ণব্যবস্থা এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও নিজেদের "আল্লাহর প্রিয় সন্তান" বলে ভাবত (মায়িদা ৫:১৮) এবং মনে করত কেবল তারাই মুক্তি লাভ করবে-যা কুরআন প্রত্যাখ্যান করেছে (বাকারা ২:১১১)।

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

ইসলাম শিক্ষা দেয় যে প্রতিটি শিশু ফিতরাতের ওপর-শুদ্ধ প্রকৃতির ওপর-জন্মায়, যাতে সে সঠিক ও বেঠিক পার্থক্য করতে পারে। (রূম ৩০:৩০)।

সুতরাং ইসলাম এমন এক ব্যবস্থা প্রদান করেছে যেখানে কাউকে জাতি, বংশ, রঙ, গোত্র ইত্যাদির ভিত্তিতে অবমাননা করা যাবে না এবং কাউকে হীনমন্যতায় নিমজ্জিত করা যাবে না। এজন্য ইসলাম কঠোরভাবে অহংকার ও উপহাস নিষিদ্ধ করেছে:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ

"হে মুমিনগণ! কোনো সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস না করে; হতে পারে তারা তাদের চেয়ে উত্তম তোমরা একে অপরকে অবমাননাকর উপাধিতে ডেকো না।" (হুজুরাত:১২)

আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে সমতা

কুরআন স্পষ্টভাবে বলে যে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ সকল জাতির জন্য উন্মুক্ত। যে-ই আল্লাহর প্রতি সমর্পিত হবে ও সৎকর্ম সম্পাদন করবে সে-ই পুরস্কৃত হবে

بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔ (البقرۃ:113)

অর্থাৎ- না, বরং যে কেহ আল্লাহ্‌র সমীপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মশীল হয় সেইক্ষেত্রে তাহার জন্য তাহার প্রভুর নিকট প্রতিদান রহিয়াছে এবং না তাহাদের উপর কোন ভয় আসিবে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে।

(বাকারা ২:১১৩)

ইসলামী শিক্ষানুসারে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী এবং সেই অনুসারে নিজের কর্ম সম্পাদন করে, তার ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা সে তার কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান পাবে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔

অর্থাৎ নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে তাহারা এবং সাবীগণ এবং খৃষ্টানগণ- যে কেহ ঈমান আনে আল্লাহ্‌র উপর এবং পরকালের উপর এবং সৎকর্ম করে না, না তাহাদের কোন ভয় থাকিবে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে।

(মায়িদা ৫:৭০)।

নবীগণের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য

সৃষ্টির আদিকাল থেকে সত্যিকারের স্রষ্টা অবিরত নবীগণকে প্রেরণ করেছেন, যারা মানবজাতিকে আল্লাহর উপাসনা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে সমাজের সব শ্রেণির মানুষ সমান অধিকার ভোগ করতে পারে। এই উদ্দেশ্য তখনই বাস্তবায়িত হতে পারে, যখন মানুষের মধ্যে নিষ্ঠা, শিষ্টাচার, সাহস, ধৈর্য, সহমর্মিতা, সহনশীলতা এবং অন্যান্য উচ্চ নৈতিক গুণাবলি বিকশিত হয়।

এ কারণে বিশ্বের সকল ধর্মীয় নেতাই এক সুরে একই নৈতিক শিক্ষা প্রদান করেছেন: সত্য বচন একটি উত্তম গুণ এবং মিথ্যা বচনএকটি অসৎ কার্য; ন্যায় ও সুবিচার পুণ্য এবং অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন পাপ; পারস্পরিক স্নেহ ও ভালোবাসার মাধ্যমে একত্রে জীবনযাপন করা মানবিক মর্যাদার লক্ষণ, আর পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করা পশুসুলভ বৈশিষ্ট্য; দান-খয়রাত পুণ্যকর্ম, আর চুরি ও ডাকাতি পাপকর্ম-ইত্যাদি।

তথাপি ইসলাম ধর্ম সর্বোচ্চ প্রতিপত্তি ও মর্যাদার অধিকারী। রসুল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মিশনের উদ্দেশ্য এই ভাষায় ব্যক্ত করেছেন:

"আমি উত্তম নৈতিক গুণাবলির পূর্ণতা সাধনের জন্য প্রেরিত হয়েছি।" নিঃসন্দেহে, তিনি শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং প্রত্যেক গুণকে এর সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত করেছিলেন। অতএব, সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজেই পবিত্র কুরআনে তাঁর মহিমান্বিত চরিত্রের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন:

"নিশ্চয়ই তুমি মহৎ নৈতিক গুণাবলির সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত"

(সূরা আল-কলম, ৬৮:৫)।

মক্কাবাসী যুগের প্রারম্ভে, যখন হযরত আবূ যর আল-গিফারী (রাঃ) তাঁর ভাইকে নবউদিত নবীর দাবি ও শিক্ষার অনুসন্ধানে পাঠিয়েছিলেন, তিনি ফিরে এসে জানালেন: "আমি তাঁকে মানুষের মধ্যে উত্তম নৈতিকতার শিক্ষা দিতে দেখেছি।"

প্রতিশ্রুত মসীহ হযরত মির্জা গুলাম আহমদ (আঃ) তাঁর কবিতায় একই সত্য প্রকাশ করেছেন:

এক অসভ্যকে প্রকৃত মানুষে রূপান্তরিত করা এক অলৌকিক ব্যাপার; এই বৈশিষ্ট্য দ্বারাই নবুয়তের রহস্য উদ্ভাসিত হয়।

"বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১, পৃ: ১৪৪)

দাসদের প্রতি সদাচরণ সাম্যের অনন্য দৃষ্টান্ত

ইসলাম দাসমুক্তির বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এটিকে একটি সৎকর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছে। স্বাধীনতা যেহেতু এক মহান অনুগ্রহ, তাই আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে স্বাধীন অবস্থায়ই সৃষ্টি করেছেন। ইসলামের পূর্বে সারাবিশ্বেই মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা এক সাধারণ প্রথা ছিল। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো আরবেও দাসপ্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল; শুধু তাই নয়, দাস রাখা ছিল সামাজিক মর্যাদা ও সম্মানের পরিমাপক।

প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করে ইসলাম দাসমুক্তিকারীদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ঘোষণা করেছে, যাতে মুসলমানগণ দ্রুত এই কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারে। আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন যে রক্তক্ষয়ী উন্মুক্ত যুদ্ধ ব্যতীত বন্দিগ্রহণ করা বৈধ নয়। তিনি বলেন:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ ۭ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۡ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ (الانفال:68)

"কোনো নবীর জন্য বৈধ নয় যে তিনি ভূমিতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ না করে বন্দিগ্রহণ করবেন। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ চান আখিরাত।" (আল-আনফাল: ৬৮)

হজরত আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Sayen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তুমি বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Berhampur, Murshidabad

"যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান দাসকে মুক্ত করবে, আল্লাহ তাকে দোজখ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি প্রদান করবেন।"

(সহীহ আল-বুখারি, কিতাব কাফ্ফারাতুল আইমান, হাদিস ৬৭১৫)

হজরত আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) বর্ণনা করেন: "সূর্যগ্রহণের সময় নবী করীম (সা.) দাস মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।"

(সহীহ আল-বুখারি, কিতাবুল ইতিক, হাদিস ২৫১৯)

ফলে সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ এবং অন্যান্য উপলক্ষে বিপুল সংখ্যক-বরং শত শত ও হাজার হাজার-দাস ও দাসীকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছিল। এমনকি নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দয়াশীল হৃদয় দাসপ্রথাকে ঘৃণা করত। হজরত খাদিজা (রা.)-এর সঙ্গে বিবাহের পর যে দাসরা তাঁর নিকট এসেছিল, তিনি তাঁদের সবাইকে মুক্ত করে দেন। তাদের মধ্যে ছিলেন হজরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.), যাকে তিনি পরে দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রতি এমন স্নেহময় আচরণ করেন যে, যখন যায়েদের প্রকৃত পিতামাতা তাঁকে নিতে আসেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহৎ ব্যবহারের কারণে তাঁদের সঙ্গে যেতে অস্বীকৃতি জানান।

(উসুদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সহাবাহ, খণ্ড ২, যায়েদ ইবনে হারিসা-পৃষ্ঠা ১৪১-১৪২, দারুল ফিকর, বৈরুত, ২০০৩)

অতএব, ইসলাম-প্রতিষ্ঠাতা (সা.) এমন একটি ধীর, প্রজ্ঞাপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন যার মাধ্যমে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হয়-**এক ব্যবস্থা, যার দ্বারা অগণিত মানুষ স্বাধীনতার মতো মহান নিয়ামত লাভ করেছে এবং ইসলামে দাসপ্রথার স্থায়ী অবসান ঘটেছে।**

ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে মুসলমানরা বাধ্য হয়ে অংশগ্রহণ করলেও, যুদ্ধবন্দীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত কোমল ও মানবিক আচরণ করতেন। তাঁদের হয় অনুগ্রহস্বরূপ, নয়তো মুক্তিপণ গ্রহণ করে স্বাধীনতা দান করা হতো, যেমন আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন:

فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً (محمد:5)

(মুহাম্মদ: ৫)

"অতঃপর, পরে তোমরা হয় অনুগ্রহস্বরূপ মুক্তি দেবে, নয়তো মুক্তিপণ গ্রহণ করবে।"

ইসলামের ইতিহাসে বন্দীদের প্রতি দয়া ও উপকার প্রদর্শনের অসংখ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে। বদরের যুদ্ধে আটককৃত কয়েকজন বন্দী মুসলিম শিশুদের পড়তে ও লিখতে শেখালে তাদের মুক্তি প্রদান করা হয়। যখন রাসূলুল্লাহ - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - হযরত জুওইরিয়া (রা.)-কে বিবাহ করেন, তখন সাহাবাগণ (রা.) ব?? মুস্তালিক গোত্রের একশত পরিবারকে মুক্ত করে দেন, কেবলমাত্র এই কারণে যে তারা বিবাহসূত্রে নবী করিমের স্বজন হয়ে গিয়েছিল।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল ইৎক)

বিভিন্ন সময়ে নবী করিম - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - একসঙ্গে হাজার হাজার বন্দীকে মুক্তি দিয়ে দয়া ও অনুগ্রহের সর্বোচ্চ উদাহরণ স্থাপন করেছেন। হুনাইনের যুদ্ধে বনী হাওয়াজিন গোত্রের ছয় হাজার বন্দীকে তাদের আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে বিনা মুক্তিপণে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়।

(সহীহ বুখারি, কিতাবুল মাগাজি, বাব গাজওয়াতু হুনাইন)

প্রতিশ্রুত মসীহ হযরত মির্জা গুলাম আহমদ (আ.) বলেন:

"ইসলাম এ মতের সমর্থন করে না যে কাফিরদের বন্দীদের দাস-দাসী বানানো হবে। বরং দাসমুক্তির ব্যাপারে কুরআনে এমন জোরারোপ করা হয়েছে, যার চেয়ে অধিক কল্পনা করা যায় না। সংক্ষেপে, দাস ও দাসী বানানোর প্রচলন কাফিরদের থেকেই শুরু হয়েছিল, এবং ইসলামে এটি কেবল বিচারিক শাস্তি হিসেবে চলমান ছিল-তবুও এই সীমার মধ্যেই তাদের মুক্তির জন্য প্রবল উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।"

(চশমা-এ-মারিফাত, রুহানী খাজাইন, খণ্ড ২৩, পৃ. ২৫৪-২৫৫)

যে সমাজে দাসদের পশুর থেকেও অধম আচরণ করা হতো, সেখানে নবী করিমের শিক্ষার পবিত্র প্রভাব এবং তাঁর উত্তম ব্যক্তিগত উদাহরণের বরকতে এক বিস্ময়কর নৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়; এমনকি মালিক ও দাস ভাইয়ের মতো হয়ে যায়। দাসদের সম্পর্কে নবী করিম - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - নির্দেশ দেন যে, নিজে যা পরিধান করবে তাদেরও তা পরাবে, নিজে যা খাবে তাদেরও তা খাওয়াবে, তাদের সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেবে না, বরং কঠিন কাজে তাদের সাহায্য করবে। নিবেদিতপ্রাণ সাহাবাগণ (রা.) এ নির্দেশসমূহ পূর্ণ মনোযোগ ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করেন এবং অনন্য বাস্তব উদাহরণ স্থাপন করেন।

কবির ভাষায়:

"দয়ার হৃদয় সৃষ্টি করল মানুষকে, নতুবা উপাসনার জন্য ফেরেশতারা-ই যথেষ্ট ছিল।"

বর্ণিত আছে, একবার কেউ হযরত আবু জর গিফারী (রা.)-কে নতুন পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে তার দাসও একই রকম নতুন পোশাক পরেছে। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "আমি একবার একজনকে গালি দিয়েছিলাম, এবং সে নবী করিমের কাছে আমার অভিযোগ করে। নবী করিম - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - আমাকে বললেন, 'তুমি কি তাকে তার মায়ের ব্যাপারে কটূক্তি করেছিলে?' এরপর তিনি বললেন, 'তোমাদের চাকর-বাকররাই তোমাদের ভাই; আল্লাহ তাদের তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং যার ভাই তার অধীনে থাকে সে যেন তাকে নিজের মতোই খাদ্য খাওয়ায়, নিজের মতোই বস্ত্র পরিধান করায়; এবং তাদের এমন কাজ দিও না যা তাদের অবসন্ন করে দেয়। যদি এমন কাজ দিতে হয়, তবে তাদেরকে সাহায্য করবে।'

(সহীহ বুখারি, কিতাবুল ইৎক, হাদিস ২৫৪৫)

নবী করিম - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - আরও নির্দেশ দেন যে, যখন কোনো দাস খাদ্য নিয়ে আসে, তাকে পাশে বসিয়ে খাওয়াতে হবে; যদি সে অস্বীকার করে, তবে অন্তত কিছু খাদ্য তাকে দিতে হবে, কারণ সে খাদ্য প্রস্তুতের সময় আগুনের তাপ ও ধোঁয়া সহ্য করেছে।

(ইবন মাজাহ, কিতাবুল আতিমাহ)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আরও বর্ণনা করেন:

"বলা হয় যে ইমাম হাসান (রা.)-এর কাছে এক দাস চায়ের পেয়ালা নিয়ে আসে। কাছে পৌঁছানোর সময় ভুলক্রমে পেয়ালা তাঁর মাথায় পড়ে যায়। ব্যথা অনুভব করে তিনি দাসটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। দাস ধীরে বলল, 'ওয়াল কাজিমিনা আল-গাইজ।' ইমাম হাসান (রা.) বললেন, 'আমি ক্রোধ সংবরণ করলাম।' দাস আবার বলল, 'ওয়াল আফিনা আনিন্নাস।' ক্রোধ দমন মানে বাহ্যিক সংযম, কিন্তু অন্তর থেকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি নাও থাকতে পারে; তাই ক্ষমার শর্ত আরোপ হয়েছে। ইমাম বললেন, 'আমি ক্ষমা করলাম।' এরপর দাস বলল, 'ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন।' (আলে ইমরান: ১৩৫) আল্লাহ তাদেরই ভালোবাসেন যারা ক্রোধ সংবরণ ও ক্ষমার পর উপকার করে। ইমাম হাসান (রা.) বললেন, 'যাও-তোমাকে মুক্তি দিলাম।' একটি চায়ের পেয়ালার কারণে একটি দাস মুক্তি পেল। বলো-এ উদাহরণ তাদের নীতির উৎকর্ষ থেকেই উদ্ভূত।"

(মালফুজাত, খণ্ড ১, পৃ. ১১৫, ২০০৩ সংস্করণ)

নবী করিম - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - সমাজের এই অত্যাচারিত শ্রেণিকে শুধু দাসত্ব থেকে মুক্ত করেননি, বরং তাদের আত্মমর্যাদাও পুনরুদ্ধার করেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে নবী করিম বললেন: "তোমাদের কেউ যেন নিজের দাসকে 'হে আমার দাস' বা 'হে আমার দাসী' বলে সম্বোধন না করে; বরং বলবে 'হে তরুণ' বা 'হে তরুণী', কিংবা বলবে 'হে আমার সন্তান'।"

যুগ ইমামের বাণী

সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে। (সহী মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাত)

দোয়াপ্রার্থী: Jahan ara Begum, Bhagwangola, Murshdabad

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

(সহীহ বুখারি, কিতাবুল ইৎক, হাদিস ২৫৫২)

নবী করিম – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম – তাঁর নিবেদিতপ্রাণ দাস হযরত বিলাল হাবশী (রা.)-এর ওপর মক্কার কাফিরদের নিক্ষিপ্ত নৃশংস নির্যাতনও স্মরণ রাখেন এবং ঘোষণা করেন: "আজ যে বিলালের পতাকার নিচে আশ্রয় নেবে, তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে।"

(সীরতুল হালাবিয়্যাহ, খণ্ড ৩, পৃ. ৯৭)

নবী করিম (সা.) ও অন্যান্য সাহাবাদের মতো হযরত উমর (রা.)-এরও হযরত বিলাল (রা.)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। যখন বিলাল (রা.) ইন্তেকাল করেন, উমর (রা.) বলেন: "আজ মুসলমানদের নেতা মৃত্যুবরণ করলেন।"

এটি এক দরিদ্র হাবশি দাস সম্পর্কে যুগের শাসকের উক্তি।

(সীরতে খাতামন্নাবীঈন, পৃ. ১২৪-১২৫)

বর্ণনায় আরও আছে, নবী করিমের ইন্তেকালের পর যখনই বিলাল (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন, উমর (রা.) তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতেন এবং বলতেন: "আন্তা আখুনা ওয়া মাওলানা- অর্থাৎ, "হে বিলাল, আপনি আমাদের ভাই এবং আমাদের সম্মানিতজন।"

মানবসমতার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে যে, প্রতি বছর হজের সময় বিভিন্ন বর্ণ, রং ও ভাষার মানুষ একই সাদা পোশাক পরিধান করে এক স্থানে সমবেত হয় এবং "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক"ধ্বনিতে তাদের হৃদয় ও আত্মাকে প্রকম্পিত করে। হজের বাইরে সারা বছর জুড়ে ওমরাহ পালনের মাধ্যমেও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের এই দৃশ্য অব্যাহত থাকে। পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াতে আদায় করা নামাজও সমতার একটি পূর্ণাঙ্গ উদাহরণ- যেখানে রাজা-প্রজা সকলেই সকল পার্থক্য অতিক্রম করে এক কাতারে দাঁড়ায় এবং তাদের রবের সামনে রুকু ও সিজদা করে।

দাসপ্রথা সম্পর্কে ইসলামের মহান বিপ্লব

ইসলাম দাসমুক্তিকে মহান সওয়াব হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং ধীরে ধীরে এমন এক ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে যা দাসপ্রথাকে উপড়ে ফেলে। যুদ্ধবন্দিদের ক্ষেত্রেও কুরআন নির্দেশ দিয়েছে:

"অতঃপর তাদেরকে মুক্ত করে দাও-হয় অনুগ্রহস্বরূপ, নয়তো মুক্তিপণ গ্রহণ করে।" (মুহাম্মদ ৪৭:৪)

বদরের যুদ্ধের বন্দিদের শিশুদের শিক্ষা দিলে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। হুনাইনের যুদ্ধে ছয় হাজার বন্দিকে বিনা পণেই মুক্তি দেওয়া হয়।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) লিখেছেন:

"ইসলাম কাফেরদের দাস বা দাসী বানিয়ে রাখাকে সমর্থন করে না। বরং কুরআন তাদের মুক্তির ওপর সর্বদা জোর দিয়েছে।"

(চাশমা-এ-মা'রিফাত, রুহানী খাজাইন, খণ্ড ২৩, পৃ. ২৫৪-২৫৫)

নবী করীম (সা.) বলেছেন:

"তোমাদের দাসরা তোমাদের ভাই; তোমরা যা খাও তাদেরও তা খাওয়াও, যা পরো তাদেরও তা পরাও।

(সহিহ বুখারি, কিতাবুল-ইতিক, হাদিস ২৫৪৫)

নবী করিম (সা.) আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি কোন দাস কোন খাদ্য নিয়ে আসে, তবে তাকে মালিকের সাথে বসে আহার করার জন্য বলা উচিত; আর যদি সে বসতে পছন্দ না করে, তবে অন্তত তাকে সেই খাদ্য থেকে একটি অংশ অবশ্যই দিতে হবে, কারণ খাবার প্রস্তুতের সময় সে তাপ ও ধোঁয়া সহ্য করেছে।

(ইবন মাজাহ, কিতাবুল আত'ইমাহ)

হযরত মির্জা গুলাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) বলেন:

"বর্ণিত আছে যে একবার এক দাস ইমাম হাসান (রা.)-এর জন্য এক কাপ চা আনল। কাছে আসতেই অসাবধানতাবশত সে কাপটি ইমামের মাথার ওপর ফেলে দিল। এতে ইমাম কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করে দাসের দিকে সামান্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। তখন দাসটি মৃদুস্বরে তিলাওয়াত করল: **'ওয়াল্ কাযিমীনাল্ গাইয'**-অর্থাৎ 'যারা ক্রোধ সংবরণ করে।' এটি শুনে ইমাম হাসান বললেন: 'কাযামতু'-'আমি ক্রোধ সংবরণ করেছি।' এরপর দাসটি তিলাওয়াত করল: 'ওয়াল্ আফীনা আনিন্নাস'-অর্থাৎ 'যারা মানুষকে ক্ষমা করে।' ক্রোধ সংবরণ মানে হলো মানুষ রাগ প্রকাশ না করে নিজেকে স্থির রাখল, যদিও অন্তরে তখনও সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি নাও থাকতে পারে; তাই ক্ষমার শর্তও যোগ করা হয়েছে। এ কথা শুনে ইমাম বললেন: 'আমি ক্ষমা করেছি।' তারপর দাসটি তিলাওয়াত করল: 'ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনীন'- অর্থাৎ 'আর আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন'

(আলে ইমরান:১৩৫)।

আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন তারা হলেন সেই লোকেরা, যারা ক্রোধ দমন ও ক্ষমার পর অতিরিক্তভাবে সদাচরণও করে। তখন ইমাম হাসান বললেন: 'যাও-তুমিও মুক্ত।' সত্যবাদীদের উদাহরণ এ রকমই হয়: একজন মানুষ চায়ের কাপ ফেলেছিল, আর সে মুক্তি পেল। বলো তো-এ উদাহরণ কি কেবল এই মহান ঐশী নীতিমালার সৌন্দর্য থেকেই উদ্ভূত নয়?

(মালফুযাত, খণ্ড ১, পৃ. ১১৫, ২০০৩ সংস্করণ)

রাসূলুল্লাহ (সা.) কেবল সমাজের সবচেয়ে নিপীড়িত শ্রেণি-অর্থাৎ দাসদের-দাসত্ব মুক্তই করেননি, বরং তাদের সম্মান ও আত্মমর্যাদাও পুনরুদ্ধার করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করিম (সা.) বলেছেন:

"তোমাদের কেউ নিজের দাসকে 'হে আমার দাস' বা 'হে আমার দাসী' বলে সম্বোধন করবে না; বরং বলবে, 'হে তরুণ', 'হে তরুণী', অথবা বলবে, 'হে আমার সন্তান!'

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ই'তিক, হাদীস ২৫৫২)

একবার নবী করিম (সা.) তাঁর প্রিয় দাস বিলাল (রা.)-এর ওপর মক্কাবাসীদের চালানো নির্মম অত্যাচারের কথা স্মরণ করে ঘোষণা করলেন: "আজ যে কেউ বিলাল আল-হাবশীর পতাকার নিচে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপত্তা পাবে।"

(সীরাতুল-হালাবিয়্যাহ, খণ্ড ৩, পৃ. ৯৭)

নবী করিম (সা.) ও অন্যান্য সাহাবির ন্যায় হযরত উমর (রা.)-ও হযরত বিলালকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। বিলাল (রা.) ইন্তেকাল করলে উমর (রা.) বলেছিলেন: "আজ মুসলমানদের নেতা পৃথিবী থেকে চলে গেলেন।" সে যুগের শাসকের মুখে এক গরিব হাবশি সাবেক দাস সম্পর্কে এটি ছিল অসাধারণ স্বীকৃতি।

(সীরাতে খাতামুন্ নবব্বীন, পৃ. ১২৪-১২৫)

এমনকি উল্লেখ আছে যে, নবী করিম (সা.)-এর মৃত্যুর পর যখনই বিলাল (রা.) উমর (রা.)-এর কাছে আসতেন, উমর (রা.) তাঁকে অত্যন্ত আন্তরিকতায় অভ্যর্থনা জানিয়ে বলতেন: "আন্তা আখুনা ওয়া মাওলানা-"হে বিলাল! তুমি আমাদের ভাই এবং আমাদের প্রধান।"

মানবজীবন রক্ষায় সমতা

ইসলাম মানবজীবন ও তার মৌলিক চাহিদা সংরক্ষণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে, যাতে মানুষ পূর্ণ শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে এবং তার রবের ইবাদতে মনোনিবেশ করতে পারে। যেভাবে প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে, তেমনি তার প্রাণরক্ষাও একটি মৌলিক অধিকার। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার সমতুল্য, আর একটি প্রাণ রক্ষা করা সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করার সমান। আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (المائدة:33)

"যে কেউ কোন মানুষকে হত্যা করল-যদি না সে কারো প্রাণহত্যার প্রতিশোধ হয় বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার কারণে হয়-তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল; আর যে কেউ একটি প্রাণ রক্ষা করল, সে যেন সমস্ত মানুষকে রক্ষা করল।"

(আল-মায়েদাহ: ৩৩)

আরও বলেন:

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"আর তারা সেই প্রাণকে হত্যা করে না, যাকে আল্লাহ পবিত্র করেছেন-ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া।" (আল-ফুরকান: ৬৯)

যুগ ইমামের বাণী

অতএব, কুরআন শরীফ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া প্রধান ও আবশ্যক বিষয়।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum, From Lutful Haque Sb., Kandi (MSD)

কোরআন কেবল রাষ্ট্রকেই মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগের ক্ষমতা দিয়েছে–এবং তা কেবল তখনই, যখন কেউ খুন, বিদ্রোহ, চরম অরাজকতা সৃষ্টি বা আক্রমণাত্মক যুদ্ধের অপরাধে দোষী হয়। এ ধরনের ব্যক্তি নিজের কর্মদ্বারা নিজের জীবনাধিকার হারায়। নিরপরাধ হত্যা ইসলামে অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। বিশেষত মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরকে অন্যায়ভাবে হত্যার কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا

"আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে–তার প্রতিফল হলো জাহান্নাম, যেখানে সে চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ, তাকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ভয়াবহ শাস্তি।" (আন–নিসা: ৯৪)

বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা

মানবসমতার নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করে ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ধর্ম নির্বাচন, পালন ও প্রচারের অধিকার দিয়েছে। কোন ব্যক্তি, সমাজ বা পরিষদ এই মৌলিক স্বাধীনতা হরণ করার অধিকার রাখে না। আল্লাহ বলেন:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۟ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ (الکہف:30)

"এবং বলে দাও, 'সত্য তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে; অতএব যে ইচ্ছা করে সে ঈমান গ্রহণ করুক, আর যে ইচ্ছা করে সে অস্বীকার করুক।' (আল–কাহফ: ৩০)

ধর্মীয় ইতিহাসে দেখা যায়, নবীগণের জামাতগুলোকে ধর্মের নামে নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে–যদিও প্রকৃত ধর্ম সর্বদাই সমতা, শান্তি ও সহনশীলতার শিক্ষা দিয়েছে। হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন:

"দাসত্ব থেকে মুক্তি এবং ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা–এ উভয়ই বিশাল এক অনুগ্রহ ধর্মীয় ইতিহাসে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নবীদের অন্যতম বড় মিশন ছিল মানবমুক্তি–হোক তা ফেরাউন ও অত্যাচারী রাজাদের কবল থেকে, কিংবা ভ্রান্ত ধর্মীয় রীতিনীতি ও স্বার্থান্বেষী যাজকদের আরোপিত শৃঙ্খল থেকে। প্রত্যেক ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্তি নবীরাই এনে দেন।"

(খুতবা জুমা, ২৫ নভেম্বর ২০১১)

হজ্বে একজন মানুষ মানবসমতার সর্বোৎকৃষ্ট দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে–যেখানে বিভিন্ন বর্ণ, জাতি ও ভাষার মানুষ একই সাদা পোশাকে একত্রিত হয় এবং "লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক"ধ্বনিতে হৃদয় ও আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। সারা বছর উমরাহতেও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের একই দৃশ্য দেখা যায়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও মানবসমতা ও ভ্রাতৃত্বের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি–যেখানে রাজা ও শ্রমিক একই সারিতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায় এবং সকল পার্থক্য ভুলে এক আল্লাহর ইবাদত করে।

মানবমর্যাদায় সমতা

আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْۤ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

"নিঃসন্দেহে আমি মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট গঠনে সৃষ্টি করেছি।"

(আৎ–তীন: ৫)

এ আয়াত স্পষ্ট করে যে, আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে মর্যাদা প্রদান করেছেন, সৃষ্টি জগতের মধ্যে তাকে মহিমান্বিত অবস্থান দিয়েছেন, এবং তার শারীরিক ও আত্মিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করেছেন। আরও বলেন:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْۤ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

"আর আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি, তাদেরকে স্থল ও সমুদ্রের ওপর চালিত করেছি, তাদেরকে উত্তম রিযিক দিয়েছি এবং তাদেরকে আমার অনেক সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"

(বানী ইসরাঈল: ৭১)

হযরত মুসলিহ মাওউদ (রা.) ব্যাখ্যা করেন:

"এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ কেবল কোনও বিশেষ জাতিকে নয়, বরং সমগ্র মানবজাতিকেই মর্যাদা দান করেছেন। তাই কোন জাতি অপর জাতির চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারে না। ইহুদি ও কুরাইশরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করত–এ আয়াত তাদের জন্য সতর্কবাণী। আল্লাহ সকল জাতিকে সম্মান দিয়েছেন, কিন্তু কেউ কেউ সে সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়, কারণ তারা নিজেরাই আল্লাহ প্রদত্ত অগ্রগতির পথ বন্ধ করে দেয়। 'আমি তাদেরকে স্থল ও সমুদ্রে চলাচল করিয়েছি'–অর্থাৎ মানবসমাজের অগ্রগতির উভয় পথই উন্মুক্ত; তাই যে জাতি সম্মান পেতে চায়, তাকে স্থল ও সমুদ্র উভয় সম্পদ কাজে লাগাতে হবে।"

(তাফসীরে কবীর, খণ্ড ৬, পৃ. ৩৯১, ২০২৩ সংস্করণ)

প্রত্যেক মানুষ–ধনী হোক বা গরিব–নিজ মর্যাদাকে ভালোবাসে। অযথা তার সম্মানহানি ঘটলে সংঘর্ষ জন্ম নেয় এবং সমাজে শান্তি বিঘ্নিত হয়। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির অনুভূতি, আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান করা এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। হযরত খলিফাতুল মসীহ তৃতীয় (রহ.) বলেন:

"ইসলাম শিক্ষা দেয় যে ধনী বা গরিব, প্রত্যেক মানুষই আল্লাহর বান্দা দরিদ্র পরিবারের কোন প্রতিভাবান শিশুরও তার ক্ষমতা বিকাশের সমান অধিকার আছে, যেমনটি ধনী পরিবারের শিশুর রয়েছে।"

(খুতাবাতে নাসির, খণ্ড ১, পৃ. ৫০১)

অমুসলিমদের স্বীকৃতি

নবী করিম (সা.) তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই কোরআনিক সমতার নীতি বাস্তবায়ন করেছেন এবং সাহাবিদের অন্তরে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এমনকি অমুসলিম গবেষকেরাও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ইতালীয় ওরিয়েন্টালিস্ট ড. লরা ভেচ্চিয়া ভাগলিয়েরি লিখেছেন:

"নবী করিম (সা.) এবং তাঁর খলিফাগণের আচরণ আইনরূপে গৃহীত হয়েছিল; এবং বলা যায়–কোন অতিরঞ্জন ছাড়াই–ইসলাম সহনশীলতা প্রচারই করেনি, বরং এটিকে তার আইনব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক অংশে পরিণত করেছিল। বিজীত জাতির সাথে চুক্তির পর মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেনি এবং তাদেরকে ধর্ম পরিবর্তনে বাধ্য করেনি।"

(অ্যান ইন্টারপ্রিটেশন অব ইসলাম, পৃ. ১৪; উদ্ধৃত: উসওয়াহ ইনসান–এ–কামিল, পৃ. ৫১৬)

রোমানিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্সটান্টিন ড্যানিয়েল গিওর্গে তাঁর Muhammad গ্রন্থে লিখেছেন:

"যে বিপ্লব নবী মুহাম্মদ (সা.) আরবে আনতে চেয়েছিলেন, তা ফরাসি বিপ্লবের চেয়েও মহান। ফরাসি বিপ্লব ফরাসিদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিল; কিন্তু ইসলামের নবী যে বিপ্লব আনেন, তা মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত সমতা প্রতিষ্ঠা করে–পরিবার, বংশ, সম্পদ–সব পার্থক্য মুছে দেয়।"

(সূত্র: The Prophet of Islam in the Eyes of Non-Muslims, পৃ. ১৫৩)

হযরত খলিফাতুল মসীহ প্রথম (রা.) বলেন:

"জাহেলিয়্যাতের সেই সময়ে, যখন অর্ধেক পৃথিবী নৈতিক ও সামাজিক অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, পবিত্র নবী মানবসমতার যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা অন্য ধর্মগুলো তখন খুব একটা মূল্য দেয়নি। খ্যাতিমান ঐতিহাসিক হল্লাম লিখেছেন: 'ইসলাম আল্লাহর দাসদের সামনে পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু কখনও জোরপূর্বক আরোপ করা হয়নি। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করেছে, তাকে বিজয়ী জাতির সমঅধিকার দেওয়া হয়েছে। ইসলামের আগমনে বিজিত জাতিসমূহ সেই সব শাস্তি থেকে মুক্ত হল, যা মানবজাতির ইতিহাসজুড়ে বিজয়ীরা পরাজিতদের ওপর চাপিয়ে এসেছে।'

(হাকায়েকুল ফুরকান, খণ্ড ৪, পৃ. ৭৫)

২০১২ সালের ২৭ জুন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ভবন (ওয়াশিংটন, ডি.সি.)–এ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আ.) বলেন:

"আজ আমরা শক্তিশালী ও দুর্বল জাতির মধ্যে পার্থক্য ও বিভাজন দেখতে পাই। যেমন–জাতিসংঘে কিছু দেশকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে: কেউ স্থায়ী সদস্য, কেউ অস্থায়ী। এ বৈষম্য বিরক্তি ও অস্থিরতার জন্ম দেয়, এবং

এরপর ১৪ পাতায়...

যুগ খলীফার বাণী

যুবক খুদ্দাম ও আতফালদেরকে নিজেদের সাহচর্যের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে। বন্ধুত্ব তাদের সাথে রাখুন যাদের মধ্যে ঈমান ও নিষ্ঠা রয়েছে, যারা অনৈতিক ও অশালীন কাজকর্মে লিপ্ত নয়।

(রোযনামা আল ফজল, অনলাইন, ২৯ শে নভেম্বর, ২০২২)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

ধর্মীয় পরিবেশে শান্তির দূত

মুনীর আহমদ খাদিম, সম্পাদক -বদর পত্রিকা (উর্দু)

আজ বিশ্ব সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য তৃষ্ণার্ত এবং ন্যায় ও ইনসাফের সন্ধানে ব্যাকুল। চারদিকে তাকালেই দেখা যায় অন্ধকার ও হতাশা যেন তার কালো চাদর মেলে ধরেছে। কোথাও জাতপাত ও বংশগত বিরোধ প্রকট, কোথাও ভাষাগত দাঙ্গা বিস্ফোরিত হচ্ছে। কোনো কোনো অঞ্চলে ধর্মের নামে সংঘাত দেখা দেয়, আবার কোথাও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষে নিমজ্জিত। সংক্ষেপে বলা যায়, মানবজাতি নিজের চারপাশে ধ্বংস ও সর্বনাশের এমন ভয়াবহ গর্ত খুঁড়ে ফেলেছে যে সেগুলো ভরাট করে একটি সমতল ও নিরাপদ পথ নির্মাণ করাও এখন তার নিজের ক্ষমতার বাইরে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

উগ্রতা–যা সংকীর্ণ মানসিকতার জন্ম দেয়–বিশ্বজুড়ে সহিংসতা ও অন্যায় নিপীড়নের এক ভয়ংকর প্রেতচ্ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে। এর ফলস্বরূপ শুরু হয়েছে এমন এক বিপজ্জনক অস্ত্র প্রতিযোগিতা যে, আজ তা বন্ধ করা তো দূরের কথা, বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলো পর্যন্ত অস্ত্র হ্রাসের প্রশ্নে একক কোনো মঞ্চে একত্রিত হতে পারছে না। এমন পরিস্থিতিতে অসহায় 'সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ' মানুষের করণীয় কী? সে কি হতাশা ও নৈরাশ্যের শিকার হয়ে আন্তরিক প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করবে, নাকি এখনও আশার কোনো আলো আছে? নিশ্চয়ই আছে! কিন্তু এ কাজ আর কোনো সাধারণ মানুষের একক সাধ্যের মধ্যে নেই; এ উদ্দেশ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ এই যুগের ইমাম–কাদিয়ানের হজরত মির্জা গুলাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদি (আ.)–তাঁর খলিফাগণ এবং আহমদিয়া মুসলিম জামাতকে নিযুক্ত করেছেন।

তবে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, যারা নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, তারাও কেবল ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা থেকে বহু দূরে নয়, বরং তারা ইসলামের সুন্দর মুখচ্ছবিতে এমন কলঙ্ক লেপন করেছে যে অন্যরা এখন প্রকাশ্যেই বলতে পারছে–ইসলাম একটি সহিংস ধর্ম এবং এর প্রচারের জন্য তলোয়ার অপরিহার্য। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

এক 'রক্তপিপাসু মাহদি'–র আগমনের বিশ্বাস–যিনি এসে তলোয়ারের জোরে ইসলাম প্রচার করবেন–এমন একটি ধারণা যা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ইসলামের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে এবং এর ফলে ইসলামের শান্তিপূর্ণ প্রচারের পথে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে।

এখন শুনুন, এই তথাকথিত 'রক্তপিপাসু মাহদি'–র আগমন সম্পর্কে ধর্মীয় আলেমরা কী বলেন। হুজাজুল কিরামা–য় নিম্নরূপ সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ আছে–

"আহলে হাদিসদের বিশ্বাস অনুযায়ী, মাহদি আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই খ্রিস্টানদের হত্যা করবেন। যারা জীবিত থাকবে, তারা রাজত্ব ও শাসনক্ষমতার সব আকাঙ্ক্ষা হারাবে; তাদের মন থেকে শাসনের ভাবনাও মুছে যাবে এবং তারা অপমানিত হয়ে পলায়ন করবে।"

আবার হুজাজুল কিরামা–এর ৩৭৪ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা আছে–

"এই বিজয়ের পর মাহদি ভারতের দিকে অভিযান করবেন। ভারতের রাজাকে গলায় লোহার বেষ্টনী পরিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হবে এবং সমস্ত কোষাগার, ব্যাংক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুট করা হবে।"

একই গ্রন্থের ৪২৪ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে–

"ঈসাও মাহদির মতো তলোয়ারের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করবেন। তখন কেবল দুটি পথ খোলা থাকবে–মৃত্যু অথবা ইসলাম।"

আর আহওয়ালুল আখেরা–পুস্তকে লেখা আছে–

"যেসব খ্রিস্টান ঈমান আনবে না, তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে।" (হাকীকাতুল মাহদী থেকে উদ্ধৃত)

এই ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) ঘোষণা করেন–

"আমি সত্য বলছি–এই যুগে যে ব্যক্তি ধর্মের নামে যুদ্ধ করে, অথবা এমন যুদ্ধকে সমর্থন করে, প্রকাশ্যে বা গোপনে এমন পরামর্শ দেয়, কিংবা অন্তরে এমন বাসনা পোষণ করে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য।" (হাকীকাতুল মাহদী, পৃ. ৪)

তিনি আরও বলেন–

"হে মুসলমানগণ! তোমাদের ধর্মের প্রতি সহানুভূতি দেখাও, কিন্তু তা হোক সত্যিকারের সহানুভূতি। যুক্তির এই যুগে কি ধর্মের জন্য তলোয়ারের মাধ্যমে মানুষকে মুসলমান বানানো সমীচীন? আল্লাহকে ভয় করো এবং ইসলামের ওপর এই ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করো না। কোরআনের শিক্ষা এমন নয়, এবং মহানবী (সা.) কখনো বলেননি যে কোনো রক্তপিপাসু মাহদি বা রক্তপিপাসু মসীহ আসবেন, যিনি জোরপূর্বক মানুষকে মুসলমান করবেন এবং হত্যা করবেন।"

(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ১৫, পৃ. ১৫৬)

যখন প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলমানদের সামনে এই সত্য উপস্থাপন করলেন যে 'রক্তপিপাসু মাহদি'–র ধারণা ইসলামের পরিপন্থী এবং ইসলাম প্রচারের জন্য তলোয়ার, বর্শা, বন্দুক বা কামানের কোনো প্রয়োজন নেই–কারণ ইসলাম ধর্মীয় প্রসারের জন্য মানব রক্তপাতের কঠোর বিরোধী–তখন বিরোধী আলেম ও কট্টর মোল্লারা এই শান্তি ও মানবতার রাজপুত্রকে (নাউজুবিল্লাহ) কাফের ও ইসলাম বহির্ভূত ঘোষণা করল। এ প্রসঙ্গে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) বলেন–

"আফসোস! যেদিন থেকে আমি ভারতের মুসলমানদের জানিয়েছি যে কোনো রক্তপিপাসু মাহদি বা রক্তপিপাসু মসীহ পৃথিবীতে আসবেন না, বরং একজন শান্তিপূর্ণ সংস্কারক আসবেন–আর সেই ব্যক্তি আমি নিজেই–সেদিন থেকেই এই অজ্ঞ আলেমরা আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করছে এবং আমাকে কাফের ও ধর্মচ্যুত বলে আখ্যা দিচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয়, তারা মানব রক্তপাতকে ভালোবাসে, অথচ এটি কোরআনের শিক্ষা নয়।"

(তোহফায়ে কায়সারিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ১২, পৃ. ২৬৫)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এটি একটি বাস্তবতা যে আহমদিয়া মুসলিম জামাত ব্যতীত ইসলামের অন্যান্য বিভিন্ন দল ইসলাম প্রচারের একমাত্র উপায় হিসেবে তলোয়ারকেই বিবেচনা করেছে। তাদের মতে, মহানবী (সা.)–এর অমূল্য উপদেশ ও কোরআনের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশ মক্কার অবিশ্বাসীদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি, ফলে–নাউজুবিল্লাহ–বাধ্য হয়ে রাসূল (সা.)–কে তলোয়ার হাতে নিতে হয়েছিল। এটাই তাদের দৃষ্টিতে ইসলামী জিহাদের দর্শন।

এই প্রসঙ্গে জামাতে ইসলামী নেতা মাওলানা আবুল আলা মওদুদীর গ্রন্থ '*আল জিহাদ ফিল ইসলাম*' থেকে একটি উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন–

"তেরো বছর ধরে আল্লাহর রাসূল আরবে ইসলামের প্রচার করেছেন। উপদেশ ও শিক্ষা দানের সকল কার্যকর পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছেন। দৃঢ় যুক্তি, স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, বাগ্মিতা ও বক্তৃতার মাধ্যমে হৃদয় উষ্ণ করেছেন। আল্লাহপ্রদত্ত অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়েছেন এবং নিজের চরিত্র ও পবিত্র জীবনের মাধ্যমে নৈতিকতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য উপযোগী এমন কোনো উপায় তিনি বাদ দেননি। তবু সূর্যের মতো স্পষ্ট তাঁর সত্যতা সত্ত্বেও তাঁর জাতি দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে কিন্তু যখন উপদেশ ব্যর্থ হওয়ার পর ইসলামের আহ্বানকারী তলোয়ার হাতে নিলেন তখন ধীরে ধীরে অন্তর থেকে অশুভতা ও দুষ্কৃতির মরিচা ঝরে পড়ল।..."দূষিত স্বভাবগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে দূর হয়ে গেল; আত্মার কলুষতা অপসৃত হলো। কেবল এটুকুই নয় যে চোখের পর্দা সরে গিয়ে সত্যের আলো স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হলো, বরং গ্রীবার সেই দৃঢ়তা ও মনের সেই অহংকারও লুপ্ত হয়ে গেল–যে বৈশিষ্ট্যগুলো সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও মানুষকে তার সামনে নত হতে বাধা দেয়।"

তিনি আরও লেখেন–

"আরবদের মতোই অন্যান্য জাতিও দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করেছিল–এমনকি এক শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর এক–চতুর্থাংশ মুসলমান হয়ে যায়। এর কারণও ছিল এই যে ইসলামের তলোয়ার হৃদয়ের ওপর পড়ে থাকা পর্দাগুলো ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল।"

মওদুদীর এই বক্তব্য যদি তাঁর নাম ও গ্রন্থের উল্লেখ ছাড়া পড়া হয়,

তবে তা কোনো ইসলামবিদ্বেষী ইহুদি বা খ্রিস্টান লেখকের রচনা বলে মনে হবে–কখনোই কোনো আন্তরিক মুসলমানের নয়, বিশেষত এমন একজনের নয়, যিনি নিজেকে 'নেতা' ও রাসূলের স্বভাবজ্ঞ বলেও দাবি করেন।

প্রকৃতপক্ষে, ডোজি লিখেছেন–

"মুহাম্মদের সেনাপতিরা এক হাতে কোরআন ও অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে প্রচার করত।"

স্মিথ আরও বলেন–এমনকি সেনাপতিরাই নয়, বরং নবী নিজেই–

"তিনি এক হাতে কোরআন ও অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে বিভিন্ন জাতির কাছে যেতেন।"

অতএব, ইসলামের বিরোধীরা যে অভিযোগসমূহ ইসলামের সুন্দর মুখচ্ছবির ওপর নিক্ষেপ করেছিল, আজ সেগুলোই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তাদের কণ্ঠে, যারা নিজেদের মুসলিম নেতা ও ধর্মের অভিভাবক বলে দাবি করে।

আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ইমাম, হজরত মির্জা তাহির আহমদ (রাহেমাহুল্লাহু তা'লা), লিখেছেন–

"ইসলামের এসব শত্রুর বক্তব্য শোনো, তারপর মওদুদীর উদ্ধৃতিটি পড়ো। এটি কি সেই একই অভিযোগ নয়, যা পূর্বে বহু ইসলামের শত্রু পবিত্র নবীর বিরুদ্ধে আরোপ করেছিল–বরং আরও বেশি বিপজ্জনক ও তাঁর পবিত্রকরণ শক্তির উপর আক্রমণ রূপে? ইসলামের সমালোচকদের লেখায় কোথাও নবীর কথিত আধ্যাত্মিক দুর্বলতার এমন ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায় না, যেমনটি মওদুদী এঁকেছেন। "অর্থাৎ, নবী (সা.)–এর ধারাবাহিক তেরো বছরের ইসলামের আহ্বান নাকি হৃদয় জয় করতে ব্যর্থ হয়েছিল, অথচ তলোয়ার ও বলপ্রয়োগ সেই কাজটি সম্পন্ন করেছিল। উপদেশ ও নসিহতের সর্বাধিক কার্যকর পদ্ধতিগুলো নাকি মরুভূমির বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বর্শার ফলাই মানব হৃদয়ের গভীরতম স্তরে ইসলাম পৌঁছে দিয়েছিল। তাঁর 'দৃঢ় যুক্তি' মানববুদ্ধিতে স্থান করে নিতে পারেনি, কিন্তু গদার আঘাত শিরস্ত্রাণ ভেঙে দিয়ে তাদের বিবেককে নাকি বাধ্য করেছিল আত্মসমর্পণে। সুস্পষ্ট ও যুক্তিনির্ভর আলোচনা তাদের বোধশক্তিকে প্রভাবিত করতে পারেনি, কিন্তু অশ্বারোহী বাহিনীর গর্জন নাকি ইসলামের সত্যতার সমস্ত রহস্য তাদের কাছে উন্মোচিত করে দিয়েছিল। বাগ্মিতা ও ভাষার শৈল্পিকতা ব্যর্থ প্রমাণিত হলো; এমনকি বক্তৃতার শক্তিও হৃদয়কে এতটা উষ্ণ করতে পারেনি যে ইসলামের আলো তাদের অন্তরে উদ্ভাসিত হয়। এমনকি স্বয়ং আরশের অধিপতির পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিস্ময়কর মু'জিজাসমূহকেও এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যেন সেগুলিও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং ন্যূনতম কোনো পবিত্র নৈতিক পরিবর্তনও সৃষ্টি করতে পারেনি।..... –'যখন ইসলামের আহ্বানকারী তলোয়ার হাতে নিলেন' ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কতটা হাস্যকর এই ধারণা এবং কতটা অপমানজনক এই শব্দাবলি–যা পড়লে চোখে জল আসে, যখন বোঝা যায় যে এগুলো এমন একজন ইসলামী নেতার কলম থেকে নিঃসৃত হয়েছে, যিনি নিজেকে নবীপ্রেমিক বলে দাবি করেন।"

(মজহব নে নাম পর খুন, পৃ. ৩০)

তবু এর ঠিক এক শতাব্দী আগে, ইসলামপ্রেমী, রাসূলপ্রেমী ও কোরআনপ্রেমী–কাদিয়ানের হজরত মির্জা গুলাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদি (আ.)–ধর্মীয় অজ্ঞানে শান্তি ও নিরাপত্তার এক রাজপুত্র হিসেবে আবির্ভূত হন এবং মানবজাতির সামনে ইসলামের সুন্দর শিক্ষা উপস্থাপন করেন। গভীর দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এই স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন ও রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী আলেমরা শুধু আল্লাহর প্রেরিত এই দূতের আহ্বানই প্রত্যাখ্যান করেনি, বরং তাঁর বিরোধিতা, কষ্ট প্রদান ও নিপীড়নে কোনো ত্রুটি রাখেনি।

ইসলামী জিহাদের তাৎপর্য

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলামী জিহাদের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

"কোন কোন নির্বোধ ইসলামের বিরুদ্ধে জিহাদের অপবাদ আরোপ করে এবং বলে, এ সকল লোককে তলোয়ার দ্বারা জবরদস্তি মুসলমান করা হয়েছিল। আক্ষেপ! হাজার আক্ষেপ! এরা অবিচারে ও সত্য গোপনে তাদের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আক্ষেপ! এদের কী হয়েছে, এরা জেনেশুনে সত্য ঘটনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমাদের নবী (সা.) আরব দেশে রাজা হিসাবে প্রকাশিত হন নি যে, তাঁর মধ্যে রাজকীয় প্রতাপ ও পরাক্রম থাকার দরুন লোকেরা জীবন বাঁচানোর জন্য তাঁর পতাকাতলে এসে গিয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

অতএব প্রশ্ন হলো, তিনি তাঁর দারিদ্র, অভাব–অনটন ও একাকীত্বের অবস্থায় খোদার একত্ব ও নিজের নবুওয়ত সম্পর্কে যখন আহ্বান জানাতে শুরু করেছিলেন তখন কোন্ তলোয়ারের ভয়ে লোকেরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল? আর যদি তারা ঈমান না নিয়ে থাকতো তবে তিনি তাদের উপর বল প্রয়োগের জন্য কোন্ রাজার নিকট থেকে সেনাবাহিনী চেয়েছিল ও সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন? হে সত্যান্বেষীরা! তোমরা নিশ্চিতরূপে জেনো, এ সকল কথা সেই সকল লোকের বানানো কথা যারা ইসলামের কঠোর দুশমন। ইতিহাস দেখ, মহানবী (সা.) সেই অনাথ ছেলে যার জন্মের কয়েক দিন পরেই (অর্থাৎ তিনি মায়ের পেটে আসার পরপরই– অনুবাদক)। তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন এবং মা কেবল কয়েক মাসের শিশুকে ছেড়ে মারা গিয়েছিলেন। তখন ঐ শিশু, যার সাথে খোদার হাত ছিল, সে কারো সাহায্য ছাড়া খোদার আশ্রয়ে লালিত–পালিত হতে থাকলো। এ অসহায় ও অনাথ অবস্থায় তিনি কোন কোন লোকের ছাগলও চরিয়েছিলেন। আর খোদা ছাড়া তাঁর কোন অভিভাবক ছিল না। পঁচিশ বছর বয়সে পৌঁছার পরও তাঁর কোন চাচা তাঁকে নিজের মেয়ে দেন নি, কারণ বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁর পরিবার প্রতিপালনের কোন ক্ষমতা ছিল না। তাছাড়া তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর এবং কোন শিল্প ও পেশা তিনি জানতেন না। অতঃপর যখন তাঁর বয়স ৪০ (চল্লিশ) বছরে পৌঁছলো তখন তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে খোদার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। হেরা নামে একটি পর্বত–গুহা মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি একা একা সেখানে যেতেন, গুহার ভিতর লুকিয়ে পড়তেন এবং তাঁর খোদাকে স্মরণ করতেন। একদিন সেই গুহায় তিনি গোপনে উপাসনা করছিলেন তখন খোদা তা'লা তাঁর উপর প্রকাশিত হলেন। আর তাঁকে আদেশ জানালেন, 'জগদ্বাসী খোদার পথ ছেড়ে দিয়েছে এবং পৃথিবী পাপে কলুষিত হয়ে পড়েছে। এখন তুমি লোকদের সতর্ক কর, তারা যেন আমার শাস্তি আসার পূর্বে আমার দিকে ফিরে।'এ আদেশ শুনে তিনি ভয় পেলেন, আমি এক 'উম্মী' অর্থাৎ নিরক্ষর মানুষ। তিনি নিবেদন করলেন, 'আমি পড়তে জানি না।' তখন খোদা তাঁর বক্ষে সকল আধ্যাত্মিক জ্ঞান ভরে দিলেন এবং তাঁর হৃদয়কে আলোকিত করে দিলেন। তাঁর পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাবে গরীব ও দুর্বল ব্যক্তিরা তাঁর আনুগত্যের আওতায় আসতে শুরু করে দিল। আর যারা বড় বড় ব্যক্তি ছিল তারা শত্রুতায় বদ্ধপরিকর হলো। এমনকি অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করতে চাইলো। কয়েকজন পুরুষ ও কয়েকজন স্ত্রীলোককে খুবই কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হলো। আর শেষ হামলা এভাবে করা হলো, মহানবী (সা.)–কে হত্যা করার জন্য তারা তাঁর ঘর ঘিরে ফেললো। কিন্তু যাকে খোদা বাঁচাবেন তাকে কে মারতে পারে? খোদা তাকে তাঁর ওহী (প্রত্যাদেশ বাণী) দ্বারা জানালেন, 'এ শহর থেকে বেরিয়ে পড় এবং আমি তোমার প্রতি পদক্ষেপে তোমার সাথে থাকবো।' অতএব তিনি আবু বকর (রা.)–কে সাথে নিয়ে মক্কা নগরী থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং তিন রাত 'সওর' নামক গুহায় লুকিয়ে রইলেন। শত্রুরা তাঁদের পিছু ধাওয়া করলো এবং

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: "সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত সর্বদা সদয় আচরণ কর।" (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে গুহা পর্যন্ত পৌঁছলো। সে গুহা পর্যন্ত পায়ের চিহ্ন দেখিয়ে দিয়ে বললো, 'এ গুহায় সন্ধান কর। এরপর আর কোন চিহ্ন নেই। আর যদি এরপরও কোথাও গিয়ে থাকে তবে আকাশে উঠে থাকবে।' কিন্তু কে খোদায়ী শক্তির বিস্ময়কর কার্যাবলীর কুল কিনারা করতে পারে? খোদা এক রাতেই নিজ মহিমা এভাবে প্রকাশ করলেন, মাকড়সা তার জাল বুনে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল এবং কবুতরী গুহার মুখে বাসা বেধে ডিম পেড়ে বসলো। যখন পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞ লোকদেরকে সেই গুহার ভিতরে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করছিল তখন এক বৃদ্ধ বললো, 'এ পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞ পাগল হয়ে গেছে। আমিতো এ জালকে গুহার মুখে সেই যুগ থেকে দেখে আসছি যখন মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মই হয় নি।' এ কথা শুনে সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং গুহার প্রসঙ্গ ছেড়ে দিল।

অতঃপর মহানবী (সা.) গোপনে মদীনায় পৌঁছলেন এবং মদীনার অধিকাংশ লোক তাঁকে গ্রহণ করে নিল। এতে মক্কাবাসীদের ক্রোধ জ্বলে উঠলো। তারা আক্ষেপ করলো, আমাদের শিকার আমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেল। অতঃপর তারা দিন রাত এ ষড়যন্ত্র করতে লাগলো কীভাবে মহানবী (সা.)-কে হত্যা করা যায়। যে অল্প সংখ্যক লোক মক্কায় মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান

এনেছিল, তারাও মক্কা থেকে হিজরত করে বিভিন্ন দেশে চলে গিয়েছিল। কেউ কেউ আবিসিনিয়ার রাজার আশ্রয় নিয়ে নিয়েছিল। আর কেউ কেউ মক্কাতেই থেকে যায়। কেননা সফরের জন্য তাদের নিকট পথ খরচ ছিল না। তাদেরকে অনেক কষ্ট দেয়া হলো। এরা কেমন করে দিন রাত ফরিয়াদ করতো তা কুরআন শরীফে বর্ণিত রয়েছে।

অতঃপর অস্বীকারকারী কুরাইশদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেল। তারা গরীব স্ত্রীলোকদেরকে ও অনাথ শিশুদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করলো। কোন কোন স্ত্রীলোককে এমন নির্মমভাবে হত্যা করা হলো যে, তাদের দু'পা দড়ি দিয়ে দু'উটের সাথে বেঁধে সেই উট দু'টোকে বিপরীত দিকে দৌঁড়ানো হলো। আর এভাবে ঐ সকল স্ত্রীলোক দু'টুকরো হয়ে মরে গেল।

যখন নিষ্ঠুর কাফেরদের অত্যাচার এতদূর পর্যন্ত পৌঁছলো তখন সেই খোদা, যিনি অবশেষে নিজ বান্দাদের প্রতি করুণা করেন, তিনি নিজ রসূলের প্রতি ওহী অবতীর্ণ করলেন, 'অত্যাচারিতদের ফরিয়াদ আমার নিকট পৌঁছে গেছে।

আজ আমি অনুমতি দিচ্ছি তোমরাও তাদের মোকাবিলা কর। আর স্মরণ রেখো, যারা নিরপরাধ লোকদের উপর তলোয়ার উঠায় তাদেরকে তলোয়ার দিয়েই ধ্বংস করা হবে। কিন্তু তোমরা সীমালংঘন করো না। কেননা খোদা সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেন না।'

এটাই হলো ইসলামী জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্য। এটাকে নিতান্ত অন্যায়ভাবে বিকৃত করে বর্ণনা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে খোদা (শাস্তি প্রদানে) ধীর। কিন্তু যখন কোন জাতির দুষ্কর্ম সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তিনি অত্যাচারীকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়েন না এবং তিনি তাদের জন্য ধ্বংসের উপকরণ সৃষ্টি করে দেন। আমি জানি না আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা কোথা থেকে এবং কার কাছ থেকে শুনেছে, ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রসার লাভ করেছে। খোদা-তো কুরআন শরীফে বলেন, 'লা ইকরাহা ফিদ্দীনে'। অর্থাৎ, ইসলাম ধর্মে জবরদস্তি নেই।

(পায়গামে সুলেহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৪৬৪)

সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সুস্পষ্ট যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে ইসলামের শান্তিপূর্ণ ও জবরবিহীন শিক্ষা কোনো "রক্তাক্ত মাহদির "আবির্ভাবের সুযোগ রাখে না এবং এই ধর্ম কখনোই হিংসা, জবরদস্তি, বা তলোয়ার-বল্লমের শক্তির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেনি। প্রিয় পাঠকবৃন্দ, প্রমিত মসীহ (আ.) শুধু এটাই করেননি যে-নিজেদের ও ভিনদের দ্বারা নির্মমভাবে ইসলামের আধ্যাত্মিক ও সজীব উদ্যানের পথে বিক্ষিপ্ত কাঁটাগুলোকে পরিষ্কার করেছেন; বরং তিনি পবিত্র কোরআনের শিক্ষার আলোকে জাতীয় সংহতি, পারস্পরিক ঐক্য ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিচে বর্ণিত বহু মনোহর নীতি উপস্থাপন করেছেন।

জাতীয় ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মনোরম নীতিমালা

১. ধর্মপ্রবর্তকগণ ও তাঁদের পবিত্র গ্রন্থসমূহের সম্মান প্রদর্শন

প্রমিত মসীহ (আ.) বলেছেন যে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকল ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাগণ ও তাঁদের পবিত্র শাস্ত্রসমূহের মর্যাদা ও সত্যতা অটুট রাখা অপরিহার্য। তিনি লিখেছেন:

"এই নীতিটি অত্যন্ত মূল্যবান, শান্তিদায়ক, মিলন ও সমঝোতার ভিত্তি স্থাপনকারী এবং নৈতিক উন্নয়নে সহায়ক-যে আমরা বিশ্বের সকল নবীকে সত্য বলে গ্রহণ করি; তারা ভারতে, পারস্যে, চীনে, অথবা অন্য যে কোনো দেশে আবির্ভূত হয়ে থাকুন না কেন, এবং যাঁদের সম্মান ও মহিমা ঈশ্বর কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁদের ধর্মের শিকড়কে দৃঢ় করেছেন এবং যেসব ধর্ম বহু শতাব্দী ধরে চলমান রয়েছে। এটাই সেই নীতি যা কোরআন আমাদের শিক্ষা দিয়েছে। এই নীতির আলোকে আমরা প্রতিটি ধর্মের সেই নেতাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি-যাঁদের জীবন এই বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত; তাঁরা হিন্দু ধর্মের হোন, পারস্য ধর্মের, চীনা ধর্মের, ইহুদি ধর্মের বা খ্রিস্টীয় ধর্মের।"

(তুহফা-এ-কায়সারিয়া, রূহানি খাজাইন, খণ্ড ১২, পৃ. ২৫৯)

আমরা বেদকেও খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বলে বিশ্বাস করি এবং এর ঋষিদেরকে সম্মানিত ও পবিত্র মনে করি..... খোদার শিক্ষা অনুসারে আমাদের পাকাপোক্ত বিশ্বাস হলো, বেদ খোদার নামে মানুষের বানানো গ্রন্থ নয়। কোটি

কোটি মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবার এবং স্থায়ী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা মানুষের বানানো গ্রন্থের মধ্যে থাকে না।

(পয়গামে সুলেহ্, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩,পৃ:৪৫৩)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বলেন: তাঁর যুগের নবী ও অবতার ছিলেন এবং খোদা তাঁর সাথে কথা বলতেন।

(পয়গামে সুলেহ্, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩,পৃ:৪৪৫)

হযরত বাবা নানক (রহ.) সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না বাবা নামক একজন পুণ্যবান ও আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সেই সকল লোকের, অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁদেরকে খোদা নিজ প্রেম-সুধা পান করিয়ে থাকেন।.... তিনি হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করতে এসেছিলেন। কিন্তু আফসোস তাঁর শিক্ষার দিকে কেউই মনোযোগ দেয় নি। যদি তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব ও তাঁর শিক্ষা থেকে

কিছুটা উপকার গ্রহণ করা হতো তবে আজ হিন্দু ও মুসলমান সকলে এক হতো।

(পয়গামে সুলেহ্, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩,পৃ:৪৪৫, ৪৪৬)

হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করে প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) বলেন:

"যেমন খ্রিস্টানরা যীশু মসীহের প্রতি ভালোবাসার দাবি করে, মুসলমানরাও একইভাবে তাঁর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর অস্তিত্ব খ্রিস্টান ও মুসলমান উভয়ের জন্যই এক যৌথ উত্তরাধিকারের ন্যায়। এবং আমারই তাঁর প্রতি সর্বাধিক অধিকার রয়েছে, কারণ আমার সত্তা সম্পূর্ণভাবে যীশুর প্রেমে নিমগ্ন।"

(তুহফা-এ-কায়সারিয়্যাহ, রূহানী খাজাইন, খণ্ড ১২, পৃ. ২৭৫)

হযরত মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ান, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আলাইহিস সালাম), আরও বলেন যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাবশ্যক হলো-মুসলমানরা যেন সকল নবী এবং তাঁদের পবিত্র কিতাবসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা'লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।
(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)
দোয়াপ্রার্থী: Late Haji Ansar From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

মহান আল্লাহর বাণী
নিশ্চয়আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)
দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal, From Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

অনুরূপভাবে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও যেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং পবিত্র কুরআনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকে। এই নীতি এমন এক শান্তিদায়ক নীতি, যা মান্য করা হলে আজ বিশ্বের প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, আহমদিয়া মুসলিম জামাত ব্যতীত না অন্যান্য মুসলমানরা, না অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা এই সোনালি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

মুসলমানদের অবস্থা এমন যে, যখন প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) শ্রী কৃষ্ণ জি মহারাজ এবং রাম চন্দ্র জি মহারাজকে আল্লাহ তা'লার নবি হিসেবে প্রমাণ করেন এবং বেদসমূহের পবিত্রতা সমুন্নত রাখেন, তখন চারদিক থেকে "কাফির, কাফির–এই ধরনের অভিযোগ উঠতে থাকে। তবুও আহমদিয়া মুসলিম জামাত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে যে, অন্যেরা তাদের "কাফির "বলুক, এতে তাদের কোনো পরোয়া নেই। আল্লাহ তা'লার নবীগণের এবং তাঁদের পবিত্র কিতাবসমূহের সম্মান রক্ষার জন্য যদি রক্তের শেষ বিন্দুটিও ঢেলে দিতে হয়, আহমদিয়া জামাত সে ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

একই সঙ্গে আহমদিয়া জামাত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আন্তরিক আবেদন জানায় যে–যেমন সম্মান ও ভালোবাসা আমরা আপনাদের নবী, ঋষি–মুনি এবং পবিত্র কিতাবসমূহের প্রতি প্রদর্শন করি, তেমনই সম্মান ও শ্রদ্ধা আমরা আপনাদের কাছ থেকেও কামনা করি ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং পবিত্র কুরআনের জন্য।

কাতর আবেদন

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর বেদনাতুর আবেদনটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি (আ.) বলেন:

হে প্রিয় বন্ধুগণ! চিরকালের অভিজ্ঞতা ও বারবারের পরীক্ষা একথা প্রমাণ করে দিয়েছে, বিভিন্ন জাতির নবী ও রসূলগণকে অবমাননার সাথে স্মরণ করা ও তাঁদেরকে গালি দেয়া এমন এক বিষ, যা পরিণামে কেবল দেহকেই ধ্বংস করে না বরং আত্মাকেও ধ্বংস করে মানুষের ইহকাল ও পরকালকে বিনষ্ট করে দেয়। সেই দেশ শান্তিতে জীবন–যাপন করতে পারে না যার অধিবাসীরা একে অন্যের ধর্মের পথ প্রদর্শকগণের দোষ খুঁজে বেড়ায় এবং তাঁদের সম্মানহানীর কাজে লিপ্ত থাকে। সেই সকল জাতিতে কখনো সত্যিকারের একতা আসতে পারে না, যাদের মধ্যে এক জাতি বা উভয় জাতি একে অন্যের নবী, ঋষি এবং অবতারগণের নিন্দা ও দুর্নাম করতে থাকে। নিজেদের নবী বা ধর্ম নেতার অবমাননার কথা শুনে কার না উত্তেজনা আসে?... প্রকৃতপক্ষে যাকে আন্তরিকতা বলা যেতে পারে সে রকম আন্তরিকতা কেবলমাত্র তখন সৃষ্টি হতে পারে যখন আপনারা বেদ ও বেদের ঋষিদেরকে সরল অন্তঃকরণে খোদার পক্ষ থেকে এসেছে বলে স্বীকার করে নিবেন আর তদরূপই হিন্দুরাও যখন তাদের কার্পণ্য দূর করে আমাদের নবী (সা.)–এর নবুওয়তকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবেন। স্মরণ রেখো এবং খুব ভাল করে স্মরণ রেখো! তোমাদের ও হিন্দুদের মাঝে সত্যিকারের শান্তি স্থাপনের একমাত্র উপায় এটাই এবং এটাই এমন এক পানি যা হৃদয়ের ময়লা ধুয়ে দেবে।

(পয়গামে সুলেহ্, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড–২৩,পৃ:৪৫২ ও ৪৫৮)

উপাসনালয়ের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা

যিনি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও পবিত্র গ্রন্থসমূহের মর্যাদা ও পবিত্রতাকে অত্যন্তশ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা করেছেন–সে মহামানব, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)–তিনি পবিত্র কুরআনের শিক্ষার ভিত্তিতে অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয়ের পবিত্রতা ও অবিনশ্বরতার কথাও জোর দিয়ে তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে ইসলামের শিক্ষার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) বলেন:

"খোদা তাআলা ঘোষণা করেছেন যে সকল উপাসনালয়ের রক্ষক আমিই; আর মুসলমানদের উপর এই দায়িত্ব বর্তায় যে, উদাহরণস্বরূপ যদি তারা কোনো খ্রিস্টান দেশের উপর আধিপত্য লাভ করে, তবে তারা যেন তাদের উপাসনালয়গুলোকে বিন্দুমাত্র কষ্ট না দেয়। বরং তাদের চার্চগুলো ভাঙচুর করা থেকেও অন্যদের রোধ করবে। এই শিক্ষা হাদিসেও নিহিত আছে; কারণ বর্ণিত আছে, যখন কোনো জাতির মোকাবিলায় কোনো মুসলিম সেনাপতিকে নিযুক্ত করা হতো, তখন তাকে নির্দেশ দেওয়া হতো যেন খ্রিস্টান ও ইহুদিদের উপাসনালয়সমূহ এবং সন্ন্যাসীদের আশ্রমসমূহে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না করে। এতে বোঝা যায় যে ইসলাম কত দূরে সকল প্রকার ধর্মান্ধতা থেকে; কারণ যেমন ইসলাম মুসলমানদের মসজিদ রক্ষা করে, ঠিক তেমনি খ্রিস্টানদের চার্চ ও ইহুদিদের সিনাগগকেও রক্ষা করে।"

(চশমা–এ–মারিফাত, রূহানি খাজাইন, খণ্ড ২৩, পৃ. ৩৯৩)

৩. কোনো সম্প্রদায়ের জাতীয় আনুগত্য সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করো না শান্তির রাজপুত্র, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন যে–কোনো নাগরিকেরই অধিকার নেই তার সহনাগরিকের জাতীয় আনুগত্য নিয়ে সন্দেহ তোলার; কারণ এতে গৃহমধ্যস্থ শান্তি ধ্বংস হয় এবং বিদেশি আধিপত্যের পথ উন্মুক্ত হয়। জামাআতের মহামানব প্রতিষ্ঠাতা বলেন:

"হিন্দু ও মুসলমান এই দেশের দুটি সম্প্রদায়, এবং এ ধারণা যে–উদাহরণস্বরূপ হিন্দুরা একদিন একত্রিত হয়ে সমস্ত মুসলমানকে এ দেশ থেকে বের করে দেবে, অথবা মুসলমানরা একত্রিত হয়ে হিন্দুদের বিতাড়িত করবে–এ সম্পূর্ণ অসম্ভব্ যে ব্যক্তি অপর সম্প্রদায়ের ধ্বংস কামনা করে, সে যেন সেই ব্যক্তির মতো, যে একটি ডালের উপর বসে নিজেই সেটিকে কেটে ফেলছে।"

(পয়গামে–এ–সুলহ, রূহানি খাজায়েন, খণ্ড ২৩, পৃ. ৪৪৩)

৪. **প্রত্যেক নাগরিকের হৃদয়ে দেশপ্রেম সঞ্চার করা**

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) বলেছেন যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন–প্রত্যেক নাগরিকের হৃদয়ে দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং আইনসম্মত কর্তৃপক্ষের আনুগত্যের চেতনাকে লালন করা। পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অংশ।" তেমনিভাবে কর্তৃপক্ষের আনুগত্যও ইসলামের একটি উপাদান।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) বলেন:

"একজন সত্যিকারের মুসলমান, যে নিজের ধর্মকে সত্যিকারভাবে বুঝে, সে সর্বদা সেই সরকারের প্রতি আন্তরিকতা ও আনুগত্য বজায় রাখে, যার শান্তিপূর্ণ ছায়াতলে সে জীবন যাপন করে। ধর্মীয় ভিন্নতা তাকে সত্যিকারের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা থেকে বিরত রাখে না।"

(তুহফা–এ–কায়সারিয়্যাহ, রূহানি খাজাইন, খণ্ড ১২, পৃ. ২৮১)

তিনি আরও বলেন:

"ইসলাম কখনো আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয় না যে–আমরা এমন কোনো শাসকের প্রজাসূচক অবস্থায় থেকে, যে অন্য জাতি বা ধর্মের হলেও যার সুরক্ষায় আমরা শান্তিতে বাস করি–তার বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে অবিশ্বস্ততা বা বিদ্রোহ জন্ম দেবে। বরং ইসলাম শিক্ষা দেয় যে যদি তুমি সেই শাসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করো, যার অধীনে তোমরা শান্তিতে বসবাস করছো, তবে তোমরা আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করোনি।"

(রূহানি খাজাইন, খণ্ড ১২, পৃ. ২৮২)

সুতরাং, আহমদিয়া জামাআতের সহযোগী সংগঠনগুলোর বাইয়াতে যুবক–যুবতী ও শিশুদের শুধু ধর্মীয় সেবার জন্যই নয়, দেশসেবার জন্যও প্রস্তুত থাকার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী যুবকদের অঙ্গীকারে বলা হয়:

"আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, ধর্ম, দেশ ও জাতির স্বার্থে আমি সর্বদা জীবন, সম্পদ, সময় ও সম্মান উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকব।"

সুতরাং, প্রতিটি আহমদী যুবককে তার দেশের মর্যাদার জন্য সর্বদা ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে ৭ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুরাও প্রতিজ্ঞা করে:

"আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি সর্বদা ইসলাম ও আমার দেশের সেবায় প্রস্তুত থাকব।"

এই অঙ্গীকারসমূহ পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করে যে কোনো আহমদীকে সত্যিকার অর্থে তার ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত বলা যাবে না, যদি সে তার দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও ত্যাগের মানসিকতা না রাখে। এ প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)–এরই দান, যিনি ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে তাঁর জামাআতে এমন দেশভক্তি ও আইনানুগ আনুগত্য সৃষ্টি করেছেন যে আজ আল্লাহর তা'লার করুণায়–বিশ্বের প্রতিটি দেশে আহমদিরা দেশপ্রেমে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী। বিশ্ব স্বীকার করে যে কখনো কোনো নাশকতা, ধ্বংস বা জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতির ঘটনা আহমদিদের সাথে যুক্ত হয়নি।

৫. **ধর্মীয় মঞ্চকে বিদ্বেষ উসকে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করো না**

আজকের অনেক ধর্মীয় মঞ্চের অবস্থা হলো–সেখানকার বহু বক্তৃতা উগ্রতাকে উসকে দেয় এবং ধর্মীয় আবেগকে উত্তেজিত করে। কেউ কেউ নিজেদের ধর্মের শিক্ষা

উপস্থাপন না করে অন্যদের নিন্দা করাকেই যেন এক প্রকার সওয়াবের কাজ মনে করে।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) সমস্যাটির গভীরতা বুঝেছিলেন এবং দূরদৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছিলেন যে এর ফলে সমাজে কী বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে। তাই তিনি বিশ্বের সব ধর্মীয় নেতাকে আন্তরিক আহ্বান জানান: প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় তাদের মধ্যের দিক পরিবর্তন করুক–অন্যদের আক্রমণ না করে নিজেদের পবিত্র শাস্ত্রের আলোকে নিজেদের ধর্মের উৎকর্ষ উপস্থাপন করুক। এতে মানুষ যেখানে যাবে, সেখানেই সেই ধর্মের সৌন্দর্য শুনবে। এ পদ্ধতি প্রেম, সম্প্রীতি, ঐক্য ও সহনশীলতার আবহ সৃষ্টি করবে এবং বিদ্বেষ, দাঙ্গা ও নিরপরাধ রক্তপাতের পথ রুদ্ধ করবে।

এই সুবর্ণ শিক্ষার আলোকে আহমদিয়া জামাআতের দ্বিতীয় খলিফা হযরত মির্জা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) 'বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন'–এর প্রচলন করেন। ১৯৩৯ সাল থেকে জামাআত নিয়মিতভাবে এসব সম্মেলন আয়োজন করে আসছে। এসব সম্মেলনে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)–এর শ্রেষ্ঠ জীবনচিত্রের পাশাপাশি যিশু (আ.), কৃষ্ণ, রামচন্দ্রজি, বাবা নানক (রহ.) এবং অন্যান্য ধর্মপ্রবর্তকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে তাঁদের জীবনী ও মহান চরিত্র উপস্থাপন করা হয়। এটি অত্যন্ত বরকতময় উদ্যোগ; এবং অন্য ধর্মগুলোও যদি একই আন্তরিকতা নিয়ে এতে শামিল হয়, তবে জাতির বিষাক্ত পরিবেশ অনেকটাই শুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

৬. অতীতের সংঘাত পুনরুজ্জীবিত করো না

আজ গৃহমধ্যস্থ ও আন্তর্জাতিক শান্তি নষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ–বইপত্র ও সংবাদপত্রে পুরনো ধর্মীয় বিরোধ ও অতীতের বাস্তব বা কাল্পনিক অত্যাচারের কাহিনি বারবার উত্থাপন করা। এসব পুনরাবৃত্তি পুরনো ক্ষতকে আবার উন্মুক্ত করে, বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং বিবাদের বিষ ছড়ায়, অথচ সে যুগের অত্যাচারী ও অত্যাচারিত কেউই আজ জীবিত নেই। যুগ পাল্টেছে; বর্তমান প্রজন্মের সাথে সেসব ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই।

পবিত্র কুরআন এই অসামান্য উপদেশ প্রদান করেছে:

"ওরা ছিল এক জাতি, যা অতীত হয়েছে। তাদের কাজ তাদের জন্য, আর তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য; এবং তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না তারা কী করত।"

এই নীতির আলোকে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) জাতিকে পারস্পরিক ঐক্য, সম্প্রীতি ও নিরাপত্তার পথ নির্দেশ করেন। তিনি বলেন:

"আমরা এটাও দুঃখ করি যে মুসলিম শাসকদের যুগে যদি কোনো সময় শিখ সম্প্রদায়ের সাথে কিছু বিবাদ ও যুদ্ধ হয়ে থাকে, সেগুলো ছিল আসলে দুনিয়াবি বিষয়, নফসের প্রেরণা ও দুনিয়াবি লোভে উস্কে দেওয়া। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে রাজত্ব ও ক্ষমতা যেখানে জড়িত, সেখানে প্রতিটি ধর্মেই ভাই ভাইকে হত্যা করেছে, পুত্র পিতাকে এবং পিতা পুত্রকে হত্যা করেছে। এমন লোকেরা ধর্ম, নৈতিকতা ও আখিরাতকে তোয়াক্কা করে না তাই উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিটি মহৎ হৃদয়বান ব্যক্তির কর্তব্য হলো–সেসব স্বার্থপর রাজা ও শাসকদের কাহিনি স্মরণ করে বর্তমান পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত না করা; তারা ছিল এক জাতি, যা অতীত হয়েছে; তাদের কাজ ছিল তাদের জন্য, আর আমাদের কাজ আমাদের জন্য। তাদের কাঁটা আমরা আমাদের ক্ষেত্রেও বপন করবো কেন? আমাদের হৃদয় আমরা কেন কলুষিত করবো, কেবলমাত্র তারা এমন করেছিল বলে?

(সৎ বচন, রুহানি খাজায়েন, খণ্ড ১০, পৃ. ২৪১)

এই সুবর্ণ নীতির মাধ্যমে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) একবারে চিরতরে বন্ধ করে দিলেন সেই নির্মম চক্র–যা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে সংঘাত ও ঘৃণা ছড়ায় এবং নিরপরাধ মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়।

এই নীতির অধীনে আমাদের কর্তব্য হলো–অতীতের রাজা–বাদশা বা জাতিগোষ্ঠীর নিষ্ঠুরতার কথা পুনরুজ্জীবিত করে আজকের পরিবেশকে বিষাক্ত না করা। তারা যা করেছে, তার ফল তারা ভোগ করেছে। আমাদের কাজ হলো নিজেদের চরিত্র ও আচরণ সংশোধন করা। যদি আমরা নিজেদের মধ্যে শান্তি, মিতব্যয়, ঐক্য ও সহনশীলতা গড়ে তুলি, তবে তার মিষ্টি ফল আমরা–ই উপভোগ করব।

আজ আবারও প্রয়োজন যুদ্ধ করা–নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে নয়, বরং অন্যায়, বিদ্বেষ, বৈষম্য, অজ্ঞতা, বেকারত্ব, কূপমণ্ডূকতা ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। এটিই সেই প্রকৃত জিহাদ, যার শিক্ষা ইসলাম দেয়।

৫ পাতার পর....

যদি কোন গির্জা বা অন্য কোন উপাসনালয়ে নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তারা আমাদেরকে তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো দেখতে পাবে। যদি কোন বাণী আমাদের মসজিদ থেকে ধ্বনিত হয়, তবে তা কেবল হবে যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ।একটি বিষয় যা বিশ্বের শান্তি নষ্ট করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে তা হল, কিছু মানুষ মনে করেন যে যেহেতু তারা বুদ্ধিমান, উচ্চ–শিক্ষিত ও (তথাকথিত) মুক্ত সমাজের অংশ, সেহেতু ধর্ম প্রবর্তকদের তাচ্ছিল্য ও বিদ্রুপ করার স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। সমাজে শান্তি বজায় রাখার জন্য আবশ্যক যে, একের হৃদয়ে অন্যের প্রতি সকল প্রকার বৈরিতার অনুভূতি দূর করা আর আমাদের সহনশীলতার মাত্রাও বৃদ্ধি করা। এ প্রয়োজন রয়েছে যে, আমরা, একে অপরের নবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান রক্ষার্থে দণ্ডায়মান হই। বিশ্ববাসী আজ অস্থিরতা ও অস্বস্তির মধ্যে দিনাতিপাত করছে, আর এর ফলে আমাদের উপর দায়িত্ব বর্তায় যে, ভালবাসা ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে আমরা এ উৎকণ্ঠা ও ভীতিকে দূর করি; আর আমাদের আশেপাশের মানুষের কাছে যেন আমরা ভালবাসা ও শান্তির বার্তা পেশ করি যেন আমরা পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি সম্প্রীতির সাথে এবং ভালভাবে জীবন যাপন করতে শিখি যাতে আমরা মানবীয় মূল্যবোধসমূহকে যথাযথভাবে চিনতে পারি।

আজ পৃথিবীতে ছোট পর্যায়ের যুদ্ধ–বিগ্রহের সূত্রপাত হচ্ছে আর অন্য দিকে পরাশক্তিগুলো দাবি করছে যে তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। এটা আর গোপন বিষয় নয় যে, উপরে আমাদেরকে এক কথা বলা হয়, কিন্তু পর্দার আড়ালে প্রকৃতপক্ষে তাদেরই উদ্দেশ্য ও নীতির বাস্তবায়নের জন্য কাজ চলতে থাকে। এ অবস্থায় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব কিনা সেটাই প্রশ্ন। পরিতাপের বিষয়, যদি আমরা বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, আমরা দেখি যে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যদি এমন পথাবলম্বন করা হত যা সমতার মধ্য দিয়ে ন্যায়বিচারের দিকে আমাদের নিয়ে যেত, তবে আমাদেরকে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি দেখতে হত না, যেখানে এটি পুনরায় অগ্নিশিখায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে। এত বেশি সংখ্যক দেশের হাতে নিউক্লিয়ার অস্ত্র থাকায় পৃথিবীতে পারস্পরিক আক্রোশ ও শত্রুতা বেড়েই চলেছে আর আজ পৃথিবী ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজ যদি এসব গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র বিস্ফোরিত হয়, পরবর্তী অনেকগুলো প্রজন্ম তাদের উপর স্থায়ী প্রতিবন্ধিতা বা পঙ্গুত্ব আরোপের জন্য আমাদেরকে কোন দিন ক্ষমা করবে না। এখনো সময় আছে যে, বিশ্ববাসী তাদের স্রষ্টা ও তাঁর অপরাপর সৃষ্টির অধিকারের প্রতি মনোযোগী হতে শুরু করে।আমার বিশ্বাস যে, এখন বিশ্বের অগ্রগতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে, এটা প্রয়োজন বরং অত্যাবশ্যকীয় যে আমরা জরুরী ভিত্তিতে বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টায় গতি সঞ্চার করি। মানবজাতির জন্য তার স্রষ্টাকে চেনা আবশ্যক কেননা মানবতাকে টিকিয়ে রাখার এটিই একমাত্র নিশ্চয়তা দানকারী, নতুবা এ পৃথিবী দ্রুত আত্মাহুতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আজ যদি কেউ প্রকৃতই শান্তি স্থাপনে সফলকাম হতে চায়, তবে তার জন্য অন্যের দোষ খোঁজার চেয়ে নিজের ভেতরের শয়তানকে নিয়ন্ত্রণ করা অধিকতর প্রয়োজন। নিজ পাপ বা সীমালঙ্ঘনসমূহ দূর করে সেই ব্যক্তির উচিত ন্যায়ের এক অনুপম দৃষ্টান্ত পেশ করা। আমি বারবার বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে থাকি যে, অন্যের প্রতি এ অতিরিক্ত বৈরিতা মানবীয় মূল্যবোধসমূহকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করছে, যার ফলে বিশ্বকে নিশ্চিহ্ন করার পথে নিয়ে যাচ্ছে।যেহেতু বিশ্বে আপনার এক প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর রয়েছে, আমি আপনাকেও আরো বিস্তৃত পরিসরে বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য তাগিদ করছি যে, খোদা তা'লার প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক যে ভারসাম্য, তার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে তারা নিজেদের ধ্বংসের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ বাণী পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বিস্তৃত পরিসরে এবং পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বের সাথে দূর–দূরান্তে পৌঁছানো আবশ্যক। বিশ্বের সকল ধর্মের জন্য ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রয়োজন আর বিশ্বের সকল মানুষের জন্য ভালবাসা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রেরণা সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। আমার প্রার্থনা এই যে, আমরা সকলে যেন নিজ নিজ দায়িত্ব অনুধাবন করে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় এবং এ জগতে আমাদের স্রষ্টাকে চেনানোর প্রক্রিয়ায় নিজ ভূমিকা পালন করতে পারি। আমাদের নিজেদের হাতে দোয়ার অস্ত্র আছে, আর আমরা সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি যে পৃথিবীর ধ্বংস যেন এড়ানো যায়। আমি দোয়া করি, যে ধ্বংসযজ্ঞ আমাদের জন্য অপেক্ষমান তা থেকে আমরা যেন রক্ষা পাই।

আপনার হিতকামনায়,
মির্যা মসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ (৫ম)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব–প্রধান

যুক্তরাজ্যের ৫৯তম সালানা জলসায় ২৭ জুলাই, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বয়আত গ্রহণ অনুষ্ঠানের এক ঈমান উদ্দীপক দৃশ্য। ১১১ দেশের ৫০০টি জাতি থেকে ২,৪৪,৪০৮ জন সদস্য ভালবাসার এক সূত্রে গেঁথে রয়েছেন

যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় হুযুর আনোয়ার (আই.) ভাষণ দান করছেন

যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার একটি দৃশ্য

EDITOR
Tahir Amad Munir
Sub Editor
Mirza Safiul Alam
Mobile: 9679481821
E-mail: banglabadar@hotmail.com
badarqadian@rediffmail.com
Website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524
সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান The Weekly BADAR Qadian
Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA
Vol-10 Thursday, 18-25 Dec, 2025 Issue No.51-52

ACT. MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
MOBILE NO. +91-9815639670
e -mail:managerbadrqnd@gmail.com
ANNUAL SUBSCRIPTION
(INR) ₹: 600

আমি মানবজাতিকে ভালোবাসি মা যেমন সন্তানকে ভালোবাসে–বরং তার চেয়েও বেশি।

"পরম বিনয় ও সম্মানের সঙ্গে আমি মুসলমানদের আলেম, খ্রিস্টান মিশনারি, ভারতের হিন্দু পণ্ডিত ও আর্য সমাজের নেতৃবৃন্দকে এ ঘোষণা পাঠাচ্ছি যে নৈতিক, বিশ্বাসগত এবং আত্মিক দুর্বলতা ও ভ্রান্তির সংশোধনের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি। আমি সেই মতের বিরোধী যে ধর্মের জন্য তলোয়ার তোলা উচিত, কিংবা ধর্মের নামে ঈশ্বরের বান্দাদের রক্ত ঝরানো উচিত। আমি মুসলমান, খ্রিস্টান, হিন্দু ও আর্য সকলের নিকট এ কথা প্রকাশ করছি যে পৃথিবীতে আমার কোনো শত্রু নেই। আমি মানবজাতিকে ভালোবাসি মা যেমন সন্তানকে ভালোবাসে–বরং তার চেয়েও বেশি। মানবতার প্রতি সহানুভূতি আমার কর্তব্য, এবং মিথ্যা, শিরক, অত্যাচার, অনাচার, অবিচার ও অনৈতিকতার প্রতি ঘৃণা আমার নীতি।"

(আরবাঈন, পৃ. ১-২)

সেই দেশ শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারে না যার অধিবাসীরা একে অপরের ধর্মের পথ প্রদর্শকগণের দোষ খুঁজে বেড়ায় এবং তাঁদের সম্মানহানীর কাজে লিপ্ত থাকে।

হে প্রিয় বন্ধুগণ! চিরকালের অভিজ্ঞতা ও বারবারের পরীক্ষা একথা প্রমাণ করে দিয়েছে, বিভিন্ন জাতির নবী ও রসূলগণকে অবমাননার সাথে স্মরণ করা ও তাঁদেরকে গালি দেয়া এমন এক বিষ, যা পরিণামে কেবল দেহকেই ধ্বংস করে না বরং আত্মাকেও ধ্বংস করে মানুষের ইহকাল ও পরকালকে বিনষ্ট করে দেয়। সেই দেশ শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারে না যার অধিবাসীরা একে অপরের ধর্মের পথ প্রদর্শকগণের দোষ খুঁজে বেড়ায় এবং তাঁদের সম্মানহানীর কাজে লিপ্ত থাকে। সেই সকল জাতিতে কখনো সত্যিকারের একতা আসতে পারে না, যাদের মধ্যে এক জাতি বা উভয় জাতি একে অপরের নবী, ঋষি এবং অবতারগণের নিন্দা ও দুর্নাম করতে থাকে। নিজেদের নবী বা ধর্ম নেতার অবমাননার কথা শুনে কার না উত্তেজনা আসে?... প্রকৃতপক্ষে যাকে আন্তরিকতা বলা যেতে পারে সে রকম আন্তরিকতা কেবলমাত্র তখন সৃষ্টি হতে পারে যখন আপনারা বেদ ও বেদের ঋষিদেরকে সরল অন্তঃকরণে খোদার পক্ষ থেকে এসেছে বলে স্বীকার করে নিবেন আর তদরূপই হিন্দুরাও যখন তাদের কার্পণ্য দুর করে আমাদের নবী (সা.)-এর নবুওয়তকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবেন। স্মরণ রেখো এবং খুব ভাল করে স্মরণ রেখো! তোমাদের ও হিন্দুদের মাঝে সত্যিকারের শান্তি স্থাপনের একমাত্র উপায় এটাই এবং এটাই এমন এক পানি যা হৃদয়ের ময়লা ধুয়ে দেবে।

(পয়গামে সুলেহ্, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩,পৃ:৪৫২ ও ৪৫৮)